মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	গ	৪	গ	৫	গ	৬	ঘ	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ	১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এ স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি এখন বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক দিন এটি। দিবসটির রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ক্ষমতালিপ্সু পাকিস্তান সরকারের হীন মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ "Urdu and urdu will be the only state language of Pakistan." ঘোষণা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানে আত্মপ্রত্যয়ী ছাত্রসমাজ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশের উদ্দেশে যাত্রা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না-জানা অনেকে শহিদ হন। অবশেষে ছাত্রজনতার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিস বৈঠকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক শাখা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবসরূপে ঘোষণা করে। শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে স্মরণ করে ইউনেস্কোর এই ঘোষণা বাঙালির আরেক বিজয়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে প্রথম 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আর এভাবে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত।

১. খ. আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এর আকৃতি আয়তক্ষেত্রের মতো। এতে সবুজের মাঝে একটি লাল বৃত্ত রয়েছে। পতাকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হলো ১০ : ৬। ভবনে ব্যবহারের জন্য জাতীয় পতাকার আকার ও আয়তন হলো– ৩০৫ সেমি × ১৮৩ সেমি অর্থাৎ, ১০ ফুট × ৬ ফুট, পতাকার রঙের তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পতাকার সবুজ বর্ণ মূলত বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এটি এদেশের তারুণ্য, সজীবতা ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। আর লোহিত বর্ণ-সূর্য, নবজাগরণ, বিপ্লবী চেতনা ও সাম্যের ইঙ্গিত বহন করে। সূর্যের কিরণ যেমন সব মানুষ সমানভাবে লাভ করে, সেরূপ সুবর্ণ সূর্যখচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাও সব শ্রেণির বাংলাদেশির মধ্যে সমতা বিধান করছে। প্রয়াত শিল্পী কামরুল হাসান এর নকশা তৈরি করেন। এটি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উত্তোলন করা হয়। ১৯৭১-এর ২রা মার্চ সর্বপ্রথম এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তোলন করা হয়। তখন ঐ পতাকার নকশা কিছুটা ভিন্ন ছিল। বাংলাদেশের মানচিত্রটি তখন পতাকার মাঝখানে ছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় পতাকা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র বাদ দেওয়া হয়। আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের পরিচয়বাহী। দেশের সম্মান রক্ষার্থে এটি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। লাখ লাখ মানুষের জীবন এবং বহু মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা এ পতাকা অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি এক টুকরা কাপড়ের তৈরি হলেও এটি রক্তে নির্মিত আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। এ পতাকার মর্যাদা ও সম্মান আমরা জীবন দিয়ে রক্ষা করব।

২. ক.

১৫ই এপ্রিল, ২০২...
সাহেব বাজার, রাজশাহী

শ্রদ্ধেয় আম্মাজান,

আমার সালাম নিন। আশা করি খুব ভালো আছেন। গতকালই আপনার চিঠি পেলাম। চিঠিতে আপনি আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আসলে প্রত্যেকেরই জীবনের লক্ষ্য স্থির করা উচিত। লক্ষ্য না থাকলে জীবনে উন্নতি করা যায় না।

শৈশব থেকেই আমার খুব ইচ্ছা আমি একজন ভালো ডাক্তার হব। এজন্য আমি বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়ছি। আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমার এসএসসি পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমি A^+ পাব। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আমি ভালো একটা কলেজে ভর্তি হতে চাই। আর ডাক্তার হতে হলে আমাকে বিজ্ঞান বিভাগ ঠিক রাখতেই হবে। উচ্চ মাধ্যমিকেও ভালো ফল করতে হবে। এজন্য জোরালো প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছি। কারণ ভবিষ্যতে ভালো ডাক্তার হওয়াই আমার স্বপ্ন। আমি দেখেছি, চিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে কত দরিদ্র মানুষ কষ্ট পায়, অকালে প্রাণ হারায় কত মানুষ। আমার ইচ্ছা, ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে আমি দেশের, বিশেষত আমার গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করব। চিকিৎসাসেবাকে আমি মহৎ মানবিক সেবা বলে মনে করি। আমি এ সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে চাই।

পরিশেষে এ মহৎ পেশার মাধ্যমে আমি যেন জনগণের সেবা করতে পারি, প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি একজন চিকিৎসক হিসেবে, এই দোয়াই আপনার কাছে প্রত্যাশা করি। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

ইতি
আপনার স্নেহের
জীত

[**বি. দ্র. :** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ.

১৩ই মে, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।
বিনীত
সুমনা
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত চালক, ধারণক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্র্যাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ-সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক
সুমনা

৩. ক. মানুষের প্রকৃত মূল্য তার চরিত্রে। চরিত্রবলে সে সবকিছু জয় করে। পৃথিবীর সকল পুরুষই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। চরিত্র মানে শুধু নৈতিকতা নয়। চরিত্র মানে বিনয়, জ্ঞান, সত্যবাদিতা, সরলতা, আতিথেয়তা ও স্বাধীনপ্রিয়তা।

৩. খ. এ পৃথিবীর সব পুরাতন জঞ্জাল আর জীর্ণতা দূর করে নতুন আগন্তুককে স্থান করে দিতে হবে। তাদের জন্য বিশ্বকে বসবাসের উপযোগী করে দিতে হবে। অতীতের সব ব্যর্থতা ও ধ্বংসস্তূপ পেছনে ফেলে গড়তে হবে অনাগত সুন্দর দিনগুলো।

৪. ক. ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সবকিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সবকিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারা দিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়োজোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের সুধা তার কাছে অর্থহীন।

৪. খ. এ পৃথিবীতে সুন্দর কর্মের জন্যই মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। অক্ষয় হয়ে থাকে তার মহৎ কর্মগুলো।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, মানুষ মরণশীল। তার দেহ একদিন মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এ নশ্বর পৃথিবীতে সে আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ শুধু আহার-নিদ্রায়, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মের মূলে নিশ্চয় স্রষ্টার একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে মানুষকে বুদ্ধি না দিয়ে পশুর মতো করেই পৃথিবীতে পাঠানো হতো। মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে বলেই সে শুধু আত্মকল্যাণে জীবন কাটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, জনকল্যাণের মাঝে নিয়োজিত রেখেই সে তার মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে এই জনকল্যাণের মাপকাঠি দিয়েই মানুষের জীবনের মূল্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যে স্বার্থপর লোক শুধু নিজের সুখের জন্য কাজ করে এবং তার চারপাশের যেসব অসহায় নর নারী রয়েছে; তাদের দুঃখ মোচনের জন্য কোনো কিছুই করে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার স্মৃতি চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়। তার জন্য কেউ শোক জ্ঞাপন করে না এবং তার কথা কেউ কোনো দিন মনে রাখে না। পক্ষান্তরে অন্যের জন্য যারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, মৃত্যুর পরও তার কীর্তির কথা, তার মহত্ত্বের কথা কেউ ভোলে না। সে সকলের নিকট স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকে। মানুষ তার কর্মকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা করে।

মানুষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বয়সকালের মধ্যে নয়; বরং তার সুকর্মের স্মৃতিতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

৫. ক.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

তামান্না, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিনজন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ.

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২...

মাননীয়

প্রধান শিক্ষক,

সিলেট জিলা স্কুল, সিলেট।

বিষয় : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার প্রদত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...; স্মারক নং সজস– ২২/২০২... পত্রের আদেশক্রমে বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রদত্ত হলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তি শেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : আবুল হাসান
প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসে এক মাইলফলক স্বাধীনতাযুদ্ধ। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই ১৯৭১ সালে। রক্ত, অশ্রু, আর অপরিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক মহান বিজয়গাথা।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা : গণ-আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণানুযায়ী ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩৯০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : ইয়াহিয়া খানের পহেলা মার্চের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনতা হতবাক হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন–

- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে।
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ আহ্বানে সকল অফিস আদালত, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

আলোচনার নামে প্রহসন : ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ দশ দিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ আলোচনা ছিল প্রহসন মাত্র। এ বৈঠকের আড়ালে তারা কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে থাকে।

তীব্র আন্দোলন শুরু ও গণপ্রতিরোধ : আলোচনার নামে এরূপ প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এ আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমন্ত জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকা শহর ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথেই সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়।

অস্থায়ী সরকার গঠন : ১০ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা মুজিবনগরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয় এবং ১৭ই এপ্রিল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গণপরিষদ সদস্য ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরকেই মুজিবনগর নাম দিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয় : অস্থায়ী সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এদেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক-বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তারা পাকবাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাপ্তি : পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো এদেশের মানুষ ঘুমায় পথের ধারে, এখনো মানুষ মরে অনাহারে, এখনো জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়, মসজিদের ইমামকে গুম, হত্যা করা হয়, মন্দিরের জমি-জায়গা দখল করা হয়। এখনো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কবলে পড়ে দেশবাসী আজ বড়ো অসহায়। আর এসবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন : প্রথমত বাংলাদেশের তরুণ যুবকদের সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এরপর জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে রূপরেখা তুলে ধরতে হবে। শিক্ষা-কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ এর নানাবিধ ঘটনা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সমস্ত গণমাধ্যমে এ চেতনা বাস্তবায়নে জনমত তৈরি করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে এই মহান আদর্শকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, বরং সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে অন্তত এই বিষয়ে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনকি সমাজকাঠামোতে যে দুর্নীতির রাহুগ্রাস বর্তমান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তার মূলোৎপাটনে এগিয়ে আসতে হবে। লাখো শহিদের রক্তের মর্যাদায়, শত-সহস্র মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে।

আমরা লাখো প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠুক এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় কবির এ কবিতায়–

'স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।'

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়। এ অধ্যায় বড়ো উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেদনা ও আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বাঙালির সত্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেতনা জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতার এত দিন পরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য দলমত-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

৬. খ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করত। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক, যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ

সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে, তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

৬. গ. **ভূমিকা :** বাংলাদেশের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

অর্থনৈতিক সুচকে বাংলাদেশ : ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫,০০০ টাকা)। অথচ ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে এই হার ৮.১৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার (প্রায় ১,৬১,০০০ হাজার টাকা)। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশেরও কম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। বড়ো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র,

পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে ছোটো-বড়ো অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামো যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদনব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোর-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটাইলাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারীশিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষিশিল্প, পোশাকশিল্প, ঔষধশিল্পসহ প্রতিটি শিল্প খাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে; উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। তারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ পণ্য রপ্তানি আয়।

প্রতিবন্ধকতা : ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মতো আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগপর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারে : অদম্য বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে হয়ে থাকে। মেলার বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানে, কেনাবেচার বাণিজ্যিক লেনদেনে, মিলনের অমলিন খুশিতে, অবারিত অন্তর প্রীতির স্পর্শে মেলার দিনটি মুখর হয়ে ওঠে। বৈশাখী মেলার প্রথম দিনেই শুরু হয় ব্যবসায়ীদের হালখাতার শুভ মহরত। প্রতিটি বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানেই ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। সর্বত্রই এক মধুর প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ। বৈশাখী মেলা একদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। এ মেলায় স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সর্বপ্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী, রন্ধনশিল্পজাত সামগ্রী, ফার্নিচারসহ নিত্যব্যবহার্য আধুনিক সবধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য; যেমন– চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ইত্যাদি, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি থাকে। তাঁরা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজির গানসহ বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্য থাকে বায়োস্কোপ। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজে এখনো বৈশাখী মেলা বসে এবং এ মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল মিলনমেলায় পরিণত হয়। বৈশাখী মেলা বাঙালির আনন্দঘন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক। এ মেলা নিছক একটি আনন্দানুষ্ঠান মাত্র নয়; এটি বাঙালির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে।

১. খ. রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক দেশপ্রেমমূলক গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির সূচনায় বা জাতীয় দিবসসমূহ পালনের সময়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন সকালের সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময়ে সমবেত সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হয়। এটা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সামিল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলা শুরুর আগেও প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন: 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাউল গানের সুরে গানটি রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গানটির কথায় বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় সংগীত দেশের মানুষকে নিজ দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়।

২. ক.

২০শে মে, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর।

বিষয় : অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। গত ১৫ই মে থেকে ১৯শে মে ভীষণ জ্বর থাকায় আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, মহোদয় সমীপে সদয় প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত পাঁচ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত
আপনার অনুগত ছাত্রী
সাদিয়া জাহান
দশম শ্রেণি, ক্রমিক নং-২

২. খ.

রবীন্দ্রজয়ন্তী ১৪...

সুধী,

আগামী ২৫শে বৈশাখ, ১৪...; ৮ই মে, ২০২... শনিবার সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬...তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে স্কুল-মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ময়মনসিংহ জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব সাব্বির জামান। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন মিন্টু কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফরিদ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব সফিউল্লাহ্।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

বকুল আহম্মেদ

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

ময়মনসিংহ জিলা স্কুল ছাত্রসংসদ

অনুষ্ঠানসূচি

১০:০০ : অতিথিদের আসন গ্রহণ

১০:০৫ : 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ

১০:৩০ : প্রধান অতিথির ভাষণ

১০:৪৫ : সভাপতির ভাষণ

১১:০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি

১১:৩০ : নাটক 'চিরকুমার সভা'

১২:০০ : অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

৩. ক. অভ্যাসের দাস না হয়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। এটাই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ। মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনের জন্য চাই সাধনা। সাধনার মাধ্যমেই মানুষ পাপ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হতে পারে।

৩. খ. সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। সময়মতো কাজ না করলে তাতে কোনো লাভও হয় না। যে সময় চলে যায় তা ফিরে আসে না। কাজেই যথাসময়ে সব কাজ সম্পাদন করা উচিত। নইলে পরে অনুশোচনা করতে হয়।

৪. ক. হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। দুঃখের সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। কেননা দুঃখের পরেই আসে সুখ। দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবে এটাই স্বাভাবিক।

জগৎ-সংসারে মানুষ সর্বদাই সুখের কাঙাল, মানুষের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তই সুখের হয়ে উঠুক এটাই প্রার্থিত। দুঃখকে পরিহার করার সংগ্রামেই মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখ অর্জনের জন্য কষ্টের প্রয়োজন। আর এই কষ্টই হলো দুঃখকে বরণ করে নেওয়া। আর এ দুঃখের রজনি যতই গভীর হয় সুখের অভ্যুদয় ততই নিকটবর্তী হয়ে আসে। পতঙ্গ আনন্দ বিহারে যতই ঊর্ধ্ব গগনে উড়তে থাকে, ততই এর পতনের মুহূর্ত নিকটবর্তী হতে থাকে। দুঃখের রাত্রি পার হয়েই আসে আনন্দঘন সুপ্রভাত। সুখ মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই সুখের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখ হতেও যে অমৃত লাভ করা যায়, মানুষ তা অনুভব করে না। বাস্তব জীবনেও দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজন আছে। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পতিব্রতের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্ত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে, মানুষ নতুনতর মহিমান্বিত জীবন লাভ করে। সুতরাং দুঃখের পথ বেয়েই আসে সুখ শান্তির আয়োজন। মেঘ যতই গভীর ও ঘনতর হয়ে আসুক না কেন, সূর্যকে গ্রাস করার বা অবলুপ্ত করার মতো ক্ষমতা তার নেই। মেঘ সব সময় থাকে না। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হেসে উঠবেই। পতনোন্মুখ তরঙ্গও আবার পরক্ষণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অমাবস্যার যে অন্ধকার চাঁদকে সাময়িকভাবে গ্রাস করেছে, তার পরদিনই হেসে ওঠে নতুন চাঁদ। শীত চিরস্থায়ী নয়। শীতের পর বসন্ত আসবেই।

সুতরাং মানুষকে দুঃখরূপ কালো মেঘের ঘনঘটায় ভেঙে পড়লে চলবে না, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসে তার মোকাবিলা করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের কালো মেঘ কেটে এক সময় সুখের সোনালি সূর্য হেসে উঠবেই।

৪. খ. দেশ ও মানবকল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে ত্যাগের অনন্ত মহিমা। আর এ ত্যাগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সুখ। কিন্তু ভোগলিপ্সা শুধু লোভী করে তোলে, সুখী করতে পারে না। অপরের মঙ্গালের আত্মতৃপ্তিই বড়ো সুখ।

ভোগের কোনো শেষ নেই, কোনো পরিতৃপ্তি নেই। যতই মানুষ ধনসম্পদ ভোগ করে, ততই তার ভোগের ইচ্ছা বেড়ে যায়। ফলে প্রচুর ভোগের ব্যবস্থাও তার কাছে অতি সামান্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের দিক থেকে সে খুবই দরিদ্র হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আরও ভোগ করার অতৃপ্ত লালসার দংশন তাকে এমনভাবে জর্জরিত করতে থাকে, তার ধনসম্পদ যত বেশিই হোক তা তার কাছে অতি নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে এক দুঃখানুভূতি জাগিয়ে রাখে। যা আছে তা ভোগ করে আনন্দ লাভ করতে তার আর প্রবৃত্তি থাকে না। যা নেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে সে শুধু দুঃখকেই আহ্বান করতে থাকে। অন্যদিকে প্রত্যেক মানুষেরই দেশের প্রতি ও সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ দায়িত্ব এত বেশি যে কখনো শেষ হয় না। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষকে মহৎ করে তোলে এবং অন্তর অপার আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়। সমাজে অনেক অসহায় নারী-পুরুষ রয়েছে। তাদের বিপদে সাহায্য করতে পারলে অজ্ঞাতে অন্তরে এক অনির্বচনীয় শান্তি ও সুখের ধারা বয়ে যায়।

অতএব পরের মঙ্গালের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় এবং জীবন সার্থক হয়। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ ও শান্তি। তাই জীবনের সুন্দর বিকাশের জন্য স্বার্থত্যাগ বাঞ্ছনীয়।

৫. ক.

২৫শে জানুয়ারি, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ।

বিষয় : স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন।

সূত্র : ম.জি.স, ২০২.../২/(২৮)

মহোদয়,

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ২০২... সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা	:	তৌসিফ আহমেদ, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়	:	২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

শেরপুরে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেরপুর, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের ফুটবল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলা প্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৬. ক. **ভূমিকা :** মানবজীবনে সময়ানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা

মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে, সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত, তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে– এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না, তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইনশৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. খ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরতাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যা-পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূ কম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতিবছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূ ষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি, তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

মডেল টেস্ট- ০৩

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	ক	৩	ক	৪	গ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	খ	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ক	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. কম্পিউটার ইংরেজি ভাষার শব্দ। এটি ল্যাটিন শব্দ কমপুটেয়ার (Computare) থেকে উৎপত্তি হয়েছে; যার ইংরেজি অর্থ কম্পিউট (Compute) বা গণনা করা। সে হিসেবে কম্পিউটারের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার শুধু গণনাকারী যন্ত্র নয়। এটি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা মানুষের দেওয়া তথ্য যুক্তিসঙ্গত নির্দেশের ভিত্তিতে অতি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে গণনার কাজ করে তার সঠিক ফলাফল প্রদান করতে পারে। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে– মুদ্রণ করা, লেখাপড়া করা, তথ্য সংরক্ষণ করা, খেলা করা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, টেলিফোন করা, দেশ-বিদেশের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা ইত্যাদি। ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আধুনিক জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র এটি। বৈদ্যুতিক কম্পিউটারগুলো দুধরনের হয়ে থাকে। যথা : ১. এনালগ, ২. ডিজিটাল। এনালগ কম্পিউটার ফিজিক্যাল গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডিজিটাল কম্পিউটারগুলো সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্কের বিকল্প হিসেবে মানবকল্যাণে অনেক কাজ করে চলছে এবং মানুষের শক্তি ও সময়ের অপচয় রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সংসার খরচের হিসাব বা বাচ্চাদের গেম থেকে শুরু করে দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে এটি। তাই কম্পিউটার আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মানুষ ক্রমেই কম্পিউটার-নির্ভর হয়ে পড়ছে।

২. ক.

২৫শে মে, ২০২...
পীরগাছা, রংপুর।

প্রিয় রায়হান,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। রংপুর থেকে বেশি দূরে নয় বলে পৌঁছাতে সময় লাগল না। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
রাজিব

[বি. দ্র. : পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ. ২০শে মে, ২০২...

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
সালনা উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর।

বিষয় : অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। গত ১৫ই মে থেকে ১৯শে মে ভীষণ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত থাকায় আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।
অতএব, মহোদয় সমীপে সদয় প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত পাঁচ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।
বিনীত
আপনার অনুগত ছাত্রী
জান্নাতুল ফেরদৌসী
দশম শ্রেণি, ক্রমিক নং-২

৩. ক. অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের উন্নতির অন্তরায়। এতে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ শিক্ষার মতো সামাজিক অধিকার পায় না। ফলে দেশের বিপুল জনশক্তির অপচয় ঘটে।

৩. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যেকোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৪. ক. অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমান অপরাধ। অন্যায়ভাবে শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান হওয়া যেমন দোষের, তেমনি অন্যায় সহ্য করার মানসিকতাও সমভাবে নিন্দনীয়।
সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত এই অলিখিত কর্তব্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটলে মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু এই মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতা বা সাহস সকলের সমান হয় না। ফলে কিছু লোভী, পরশ্রীকাতর ও অত্যাচারী মানুষ দুর্বলের ওপর নির্যাতন করার সাহস পায়। অন্যায়কারীরা নিজের হীন ইচ্ছাকে বীরভোগ্য বসুন্ধরা বা Might is right ভেবে তৃপ্ত হয়। 'জোর যার মুল্লুক তার'– এই মনোভাবে বিশ্বাসীরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর চড়াও হয়– সুখশান্তি ব্যাহত করে, নির্যাতন চালায়, সম্ভ্রম ও শ্লীলতাহানি করে। কেন তারা এমন করতে পারে? বস্তুত কিছু মানুষের নীরবতা, উদাসীনতা, কাপুরুষতা, পৌরুষহীনতা পরোক্ষভাবে মদদ জোগায় অন্যায়কারীদের। যদি সমস্ত ভয় ভেঙে দুর্বলের দল, নিস্পৃহের দল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতো– তবে অন্যায়কারী পিছু হঠতে বাধ্য হতো। সেক্ষেত্রে অন্যায় কখনোই সংঘটিত হতে পারত না।
মূলত অন্যায়কে সহ্য করা, প্রকারান্তরে অন্যায়কে সমর্থন করা। তাই যে অন্যায় করে সে যেমন পাপী; যে অন্যায় কার্যকে সহ্য করে, সে-ও তেমনি পাপী ও ঘৃণ্য।

৪. খ. দুর্জন মানে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ যত বিদ্বানই হোক না কেন তার সাহচর্যে একটি পবিত্র চরিত্র সহজেই কলুষিত হয়। তাই বিদ্বান দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।
বিদ্যাশিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। বিদ্বান মানুষ তাই সকলের দ্বারা সম্মানিত, সকলের নিকট পূজনীয়। বলা হয়ে থাকে, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের ইবাদতের চেয়েও মূল্যবান। কথাটি হাদিসেই এসেছে। তাই জ্ঞানী বা বিদ্বান মানুষের মূল্য সম্পর্কে সংশয় থাকার কোনো অবকাশই নেই। বস্তুত বিদ্বান মানুষ আলোকিত, আলোকপ্রাপ্ত। পতঙ্গ যেমন আলোর কাছে ভিড় করে তেমনি সমাজের মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানীদের নীতিকথায় সকলকে বিদ্বানের সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী মানুষ পেলেই তার কাছে সভক্তিতে ছুটে যেতে হবে এমন নয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি সচ্চরিত্র ও সুন্দর মানবীয় গুণের অধিকারী না হয় তাহলে সে মূর্খের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ মূর্খ মানুষকে কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করে না। তাদের কথাও কেউ মানতে চায় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির কথা মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করে, তার জীবনাচরণকে অন্যরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা অসৎ হয় তাহলে তার দ্বারা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রবান কিনা, তা না দেখে তার প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি মানবজীবনে গড়ে না ওঠে তাহলে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের মানুষ জ্ঞানপাপী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর জ্ঞানপাপীকে এড়িয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল।
দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে সদা পরিত্যাজ্য। তার সাহচর্যে এলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই তার সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

৫. ক.

২৫শে জানুয়ারি, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ।

বিষয় : স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন।

সূত্র : ম.জি.স, ২০২.../২/(২৮)
মহোদয়,
ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ২০২... সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : তৌসিফ আহমেদ, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম : ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময় : ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ. **চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২..... ॥ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন– বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিনজন করে মোট ছয়জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

৬. ক. **ভূমিকা :** ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনই ভাষা-আন্দোলন, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরও আগে, অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা-আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একই সঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা-আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমন্ত্র।

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ– পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকারসংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ পালিত সেই ধর্মঘটে পিকেটিংয়ের সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন, 'উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয়, বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সমমর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে।

ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র

পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরও অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে। শহিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলন : ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে ওই দিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম শামসুদ্দীন।

ভাষা-আন্দোলনের অর্জন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা-আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে 'কবর' নাটক রচনা করেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লেখেন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী; শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশকে নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে চর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন- সংগ্রাম হয়েছে, তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা-আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি। ভাষা-আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনো সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার : একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা-শহিদদের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তবে তাঁদের আত্মদান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

৬. খ. **ভূমিকা :** গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্য সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিষ্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে, তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মতনির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যেকোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. গ. **ভূমিকা :** বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় খাত। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জনগণের উদার আতিথেয়তা এ শিল্পের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যপিপাসাকে নিবৃত্ত করে। এমন পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পর্যটনশিল্প। কিন্তু বাংলাদেশে এ শিল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি নেই। অথচ পর্যটনশিল্পে এদেশে অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে।

পর্যটনের পরিচয় : প্রাচীনকালে মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন। সেসময়ে যোগাযোগব্যবস্থা খুব কষ্টকর ও দুর্গম থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণপিপাসুরা ঘুরে বেড়িয়েছেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি এসব বিখ্যাত পর্যটকের অনেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিলেন। আজ পর্যটন পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মানুষের অদেখাকে দেখার অভিপ্রায় থেকেই।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন : একসময় বাংলাদেশ পর্যটনশিল্পে বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন শাসক-শোষক শ্রেণির কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের হারিয়ে যাওয়া পর্যটনশিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৪৩নং আদেশবলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্যোগ সূচিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ১৯৭৫ সালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশসাধন করা। এর ফলে এ শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা যাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। খাতটি নানাভাবে এদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্পের অবদান অতুলনীয়। পর্যটন কর্পোরেশন মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার মধ্যে একটি। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটনশিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল এবং পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-বিদেশে কর্মরত রয়েছে।

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে। দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে এদেশের আর্থিক সমৃদ্ধি এনেছে। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে, যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের আমাদের দেশটি যেন প্রাকৃতিক এক মিউজিয়াম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দৃষ্টিনন্দন এদেশটি যুগে যুগে তাই অনেক কবি-লেখক তৈরিতে সহায়ক হয়েছে এবং বিখ্যাত পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে।

বাংলাদেশের অনুপম নিসর্গ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন কেন্দ্রগুলো। এসব অনুপম নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগের জন্য বাংলাদেশ যুগে যুগে হাতছানি দিয়েছে কাছের ও দূরের ভ্রমণপিপাসুদের। তারা অবাক হয়ে এদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। অনেকেই তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় প্রশস্তি গেয়েছেন বাংলাদেশের মনোলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। তাই বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধ একজন পর্যটক বলেছেন– বাংলাদেশে প্রবেশের হাজার দুয়ার খোলা রয়েছে কিন্তু বেরুবার একটিও নেই।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দেশে ক্রমান্বয়ে বিদেশি পর্যটক এবং পর্যটন খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়ে চলেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দ্য নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন' অনলাইনে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় শীর্ষ দশ স্থানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত 'কক্সবাজার' ও বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবন'।

বাংলাদেশের পর্যটন স্পট : ভ্রমণের নেশা মানুষের স্বভাবগত। প্রকৃতি যে অন্তহীন সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসে আছে, একমাত্র দেশভ্রমণের ফলে তা পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে অবাধ চলার সুযোগ করে দিয়েছে বলেই মানুষ খুব সহজেই দেশ-দেশান্তরের দর্শনীয় স্থানগুলো উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় দেশ। বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল প্রাকৃতিক শোভা সত্যিই নয়নাভিরাম। তাছাড়া কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই উপভোগ করা যায় কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে। ঐতিহাসিক পর্যটন নিদর্শন হিসেবে খ্যাত মহাস্থানগড়, রামসাগর, সোনারগাঁ, লালবাগ দুর্গ, কান্তজীর মন্দির প্রভৃতি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত রাঙামাটি, বান্দরবান, কাপ্তাই হ্রদ, মহেশখালী, সুন্দরবন, জাফলং প্রভৃতি পর্যটন স্পট রয়েছে।

পর্যটন কেন্দ্রগুলো আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকারি উদ্যোগ : বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে গতিশীল ও আকর্ষণীয় করার জন্য এবং স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলো সুপরিচিত ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার এক্সক্লুসিভ জোন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের পর্যটনশিল্পকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য একটি খসড়া নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইনানী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপের উন্নয়নে মাস্টারপ্লানের কাজ চলছে। কুয়াকাটা পর্যটনকেন্দ্রের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ওই এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের পর্যটনশিল্প বিপুল সমৃদ্ধি বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার : বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প এক অভাবনীয় উন্নয়নের সোপান। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পকে আরও উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি আমরা বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারি। আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এদেশের পর্যটনশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে– এটাই আজকের প্রত্যাশা।

মডেল টেস্ট- ০৪

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	গ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	ঘ	৯	গ	১০	গ	১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ	২২	গ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতাসংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, পাকিস্তানি সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

১. খ. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন জ্ঞান বিতরণ করা হয়, অন্যদিকে তেমন নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিগুলোতে জ্ঞান বিতরণ করা হয় এবং যাঁরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেন তাঁদের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। যাঁরা জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা অধ্যাপক নামে এবং যাঁরা জ্ঞান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত, তাঁরা গবেষক নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশাখাগুলোকে সাধারণত মানবিক, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, আইন, চারুকলা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি শৃঙ্খলা বা অনুষদে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে উপমহাদেশে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, যার নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের সীমানার অদূরে। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো চালু আছে তার নাম আল কারাওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মরক্কোর ফেজ শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এগুলো বিভিন্ন শ্রেণিনামে পরিচিত : স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি, বেসরকারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, প্রকৌশল, মেডিকেল, বিশেষায়িত, কেন্দ্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বকে কল্যাণমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

২. ক.

১০ই জানুয়ারি, ২০২...
মতিহার, রাজশাহী।

প্রিয় রফিক,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজ আমি তোমাকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পত্র লিখতে বসেছি। আর সেটি হলো পাঠাগারে বই পড়ার উপকারিতা।

পাঠাগারে বই পড়ার উপকারিতা অত্যন্ত অপরিসীম। কারণ পাঠাগারে বিভিন্ন ধরনের বই থাকে। আর বই হলো জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হওয়ার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের মেধা ও মননশীলতার সুষ্ঠু বিকাশ সাধিত হয়। এমনকি বই পড়ার মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়া যায়। পাঠাগারে বই পড়ে আমরা যতটা সহজে জ্ঞানার্জন করতে পারি তা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। এজন্য আমি নিয়মিত পাঠাগারে গিয়ে বই পড়া শুরু করেছি। তুমিও আর দেরি না করে পাঠাগারে বই পড়া শুরু করে দাও। পাঠাগারে বই পড়ার মাধ্যমে তোমার সৃজনশীল মেধা বিকশিত হোক এ প্রত্যাশাই কামনা করছি।

তোমার বাবা-মাসহ পরিবারের সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই পত্রের সমাপ্তি টানছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
জিতু

২. খ.

১লা ডিসেম্বর, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক মানবজমিন,
জেনিথ টাওয়ার, ৪০ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিষয় : আপনার পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে আমার পত্রটি প্রকাশের আবেদন।

জনাব,

জাতীয় বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি পত্র আপনার বরাবর প্রেরণ করলাম। আশা করি পত্রটি আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক মানবজমিন' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত–

সেলিম

কাপাসিয়া, গাজীপুর।

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করুন

সারা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা বর্তমানে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর প্রধান কারণ ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন ও বনভূমি উজাড় করা। যে-কোনো দেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য মোট ভূখণ্ডের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে কাগজে-কলমে ১৭ শতাংশ বনভূমি থাকলেও বাস্তবে রয়েছে অনেক কম। প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের এ সুন্দর দেশটিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বসবাসযোগ্য করে রেখে যেতে হলে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। মূলত বৃক্ষরোপণ আজকের দিনে মানুষের অস্তিত্বের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। উপকূলের ভূমিক্ষয়, ঘন ঘন বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বৃক্ষকে মূল শক্তিরূপে গ্রহণ করা ছাড়া কোনো বিকল্প উপায় নেই। বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের চেষ্টায় প্রতিবছর জাতীয়ভাবে 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে। আমি মনে করি, এটি একটি সময়োচিত উদ্যোগ, যার সাথে দেশের সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমি দেশের প্রতিটি দায়িত্বশীল নাগরিককে 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' সফল করে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালন উপলক্ষ্যে প্রত্যেকে যদি একটি করেও গাছ লাগায়, তাহলে এদেশ আবার সবুজ-শ্যামলে ছেয়ে যাবে।

নিবেদক–

সেলিম

৩. ক. সুবিধাবাদীদের উপস্থিতি সুসময়ে দেখা যায়। দুঃখের দিনে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে এই সুসময়ের বন্ধুরা কোনো উপকারে আসে না।

৩. খ. স্বর্গ ও নরক কেবল পরলোকের ব্যাপার নয়। ইহলোকেও তা বিরাজমান। বিবেকহীন মানুষের অপকর্ম ও বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে জগৎ হয়ে ওঠে নরকতুল্য। অন্যদিকে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধনে মিলেমিশে বসবাস করলে যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে, তখন জগৎ হয়ে ওঠে স্বর্গীয় সুষমাময়।

৪. ক. ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা পালনের জন্য অন্যকে উপদেশ দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি না– এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্‌বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

৪. খ. কুসংস্কার ও লোকাচার যে-কোনো জাতির জন্য পশ্চাৎপদতার কারণ। লোকাচারে আবদ্ধ জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না।

জাতির প্রাণ শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার আলোকস্পর্শে আসার পরই কেবল যেকোনো জাতির প্রগতিশীল সমাজের প্রত্যাশা করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তর হতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পুরাতন চিন্তাধারার অপসারণ ঘটানো গেলে কল্যাণকামী জাতি গঠন সম্ভব। নদীকে স্রোতস্বিনী রাখতে হলে তার গতিপথের বাধাগুলো অপসারণ করতে হয়। তেমনি জাতীয় জীবনকে প্রগতিমুখী করার জন্য তার ভেতর মুক্তচিন্তার ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। একথা সত্য, চিন্তার মুক্তি ছাড়া মানসিক দীনতার বেড়াজাল ছিন্ন করা যায় না। আর মানসিক মুক্তি ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বসমাজে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। প্রগতির ধারায় পেছনে পড়ে গেলে জাতিকে তখন আঁকড়ে ধরে জীর্ণ লোকাচার ও কুসংস্কার। জ্ঞানানুশীলন ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার অভাবে জাতি তখন প্রাণশক্তি হারাতে থাকে। হারিয়ে যেতে থাকে তার সম্ভাবনার অপার সম্ভার। জীর্ণ অতীতের প্রতি জাতির মোহান্ধতার কারণে ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে ফিকে। জাতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যোগ্য করার জন্য আধুনিক শিক্ষা ও জীবনদৃষ্টির লালন অত্যাবশ্যক হিসেবে আমাদের মানতে হবে। সেই সাথে সকল প্রকার লোকাচার ও অজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে সবাইকে। প্রথা ও প্রাণহীন লোকাচারের বদলে মুক্তবুদ্ধির চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আর এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে আমাদের জাতি মধ্যযুগের অচলায়তনেই পথ হাতড়ে মরবে।

মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া সামাজিক প্রগতি অর্জিত হবে না। জাতীয় মুক্তির স্বার্থেই প্রথা ও লোকাচারের নিগড় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে।

৫. ক.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

তামান্না, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিনজন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ.

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২...
মাননীয়
প্রধান শিক্ষক,
সিলেট জিলা স্কুল, সিলেট।

বিষয় : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার প্রদত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...; স্মারক নং সজস– ২২/২০২... পত্রের আদেশক্রমে বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রদত্ত হলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তি শেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : রাকিব আহম্মেদ
প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** বর্তমানে বাংলাদেশে ক্রিকেট একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এদেশে যেভাবে ক্রিকেটের পরিধি বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে হয়তো ক্রিকেটই বিনোদনের অন্যতম উৎস হবে। খেলাটি বিদেশি হলেও এদেশের মানুষ তাকে একেবারে নিজের করে নিয়েছে। তারই ফল হিসেবে উত্তরোত্তর বাংলাদেশের ক্রিকেট এত সুনাম অর্জন করছে। বর্তমানে ক্রিকেট শুধু বিনোদনের উৎসই নয়, এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উৎস হিসেবেও ক্রিকেট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বে ক্রিকেটের আবির্ভাব : বিশ্বে ক্রিকেটের আবির্ভাব বহু পুরোনো। অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলার উৎপত্তি হয়। প্রথমে এ খেলাটিকে বলা হতো 'জেন্টেল ম্যানস গেম'। বর্তমানেও ক্রিকেট সম্পর্কে এই উক্তিটি প্রযোজ্য। শুরুতে অনির্ণীত সময়ের টেস্ট ক্রিকেট দিয়ে ক্রিকেটের আবির্ভাব হলেও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এসে সুনির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে বাঁধা হয় টেস্ট ক্রিকেটকে। তাছাড়া দলের খেলোয়াড়, খেলার পিচের মাপ, ক্রিকেটারদের পোশাক, ওভারপ্রতি বলের হিসাবসহ আরও নানা নিয়ম এসময় ক্রিকেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্বক্রিকেটকে আরও উন্নত করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বর্তমানে ক্রিকেটের দেখভাল করছে।

বিশ্বক্রিকেটের প্রকারভেদ : বিশ্বক্রিকেট যাত্রা শুরু করে টেস্ট ক্রিকেট দিয়ে। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে এক দিনের ক্রিকেটের ধারণা সৃষ্টি এবং ১৯৭৫ সালে প্রথম এক দিনের ক্রিকেটের বিশ্ব আসর বসে ইংল্যান্ডে। ২০০৭ সালে ক্রিকেটের ছোটো পরিসরে আরও একটি আসর বসে, যার নাম দেওয়া হয়েছে টুয়েন্টি টুয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ। বর্তমানে সাদা পোশাকের টেস্ট ক্রিকেটের পাশাপাশি রঙিন পোশাকের এক দিনের ক্রিকেট ও টুয়েন্টি টুয়েন্টি ক্রিকেট জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশের ক্রিকেট যাত্রা : বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল ৭০-এর দশকের শেষ দিকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথম সাংগঠনিক স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৭৭ সালের ২৬শে জুলাই। এই সময় বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয়। তাতে বাংলাদেশ ফিজি ও মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল। আইসিসির পূর্ণ সদস্য না হয়েও বিশ্বক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৮৬ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হয় এ যাত্রা। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের ক্রিকেট যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তার প্রথম সফল প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৯৭ সালের আইসিসি ট্রফি জয়ের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস অর্জন : ১৯৯৭ সালের আইসিসি ট্রফি জেতার কিছুদিন পরেই বাংলাদেশ একদিনের ক্রিকেট খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু টেস্ট স্ট্যাটাস না পাওয়া পর্যন্ত কোনো দেশই আইসিসির সম্পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করতে পারে না। সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি আসে ২০০০ সালের ২৬শে জুন। আইসিসির দ্বিবার্ষিক সভায় সহযোগী ৩৬টি দেশের সর্বসম্মত ভোটে বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে এবং আইসিসির দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর থেকেই বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্রমোন্নতি করছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ দল ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মতো ক্রিকেট পরাশক্তিকে টেস্টে পরাজিত করে এবং ২০২০ সালের শুরুতে জিম্বাবুয়েকে টেস্ট ও ওয়ান ডে-তেও হোয়াইট ওয়াস করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ : বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসরে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে। এই আসরে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবং প্রথমবার বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ জেতার গৌরব অর্জন করে। এরপর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে সেই ম্যাচে বাংলাদেশ সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে পরাজিত করে এবং বিশ্বক্রিকেটে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ সুপার এইটে এবং ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আফগানিস্তানের মতো দেশকে পরাজিত করলেও শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারেনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে।

বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশ : ২০১১ সালে যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ লাভ করে। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অসাধারণ এক জমকালো উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ আসরের সূচনা হয়। তাছাড়া একটি নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই আইসিসির প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান ক্রিকেটের অবস্থা : বাংলাদেশের ক্রিকেটের এখন শুধুই সামনে এগিয়ে চলা। পরপর তিনটি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এবং সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যই বর্তমান বাংলাদেশের ক্রিকেট সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা হয়। বাংলাদেশ দলের গৌরব অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান তিন ধরনের ক্রিকেটেই এখন সবচেয়ে আলোচিত ক্রিকেটার। মাশরাফির নেতৃত্ব বাংলাদেশের ক্রিকেটকে দিয়েছে অসামান্য গতি। আইপিএলে মুস্তাফিজ সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ দলের হয়ে অংশগ্রহণ করে এবং এই দল আইপিএলের শিরোপা অর্জন করেছে। এছাড়া ২০১৯ সালের যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশের যুব ক্রিকেটাররা অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে যুব বিশ্বকাপ জিততে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ : বর্তমানে বাংলাদেশে ঘরোয়া ক্রিকেটের আসর বেশ ভালো মানের খেলোয়াড় তৈরি করছে। তবে স্কুল থেকেই ভালো মানের ক্রিকেটার তৈরি করার প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এ কারণে স্কুল কলেজ পর্যায়ে আরও বেশি করে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। সেখান থেকে ভালো মানের খেলোয়াড়দের এনে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ স্কুল ও কলেজপড়ুয়া ক্রিকেটারদের হাতেই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ক্রিকেটের সাফল্য নির্ভর করছে।

উপসংহার : বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। তবে সাফল্য পেতে অনেক কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ক্রিকেট দিয়েই বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে পরিচিতি লাভ করেছে। ক্রিকেট এখন আমাদের কাছে নিখাদ বিনোদন নয়, একটি শক্তিও বটে। এই শক্তিকে আমাদের শ্রদ্ধা ও লালন করতে হবে। ক্রিকেটের সাফল্য নিয়েই বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে বাংলাদেশকে।

৬. খ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরতাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চল এবং

সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যা-পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূ কম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতিবছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূ ষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি, তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

মডেল টেস্ট- ০৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	গ	৯	খ	১০	খ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে হয়ে থাকে। মেলার বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানে, কেনাবেচার বাণিজ্যিক লেনদেনে, মিলনের অমলিন খুশিতে, অবারিত অন্তর প্রীতির স্পর্শে মেলার দিনটি মুখর হয়ে ওঠে। বৈশাখী মেলার প্রথম দিনেই শুরু হয় ব্যবসায়ীদের হালখাতার শুভ মহরত। প্রতিটি বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানেই ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। সর্বত্রই এক মধুর প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ। বৈশাখী মেলা একদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। এ মেলায় স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সর্বপ্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী, রন্ধনশিল্পজাত সামগ্রী, ফার্নিচারসহ নিত্যব্যবহার্য আধুনিক সবধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য; যেমন– চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ইত্যাদি, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি থাকে। তাঁরা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজির গানসহ বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্য থাকে বায়োস্কোপ। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজে এখনো বৈশাখী মেলা বসে এবং এ মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল মিলনমেলায় পরিণত হয়। বৈশাখী মেলা বাঙালির আনন্দঘন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক। এ মেলা নিছক একটি আনন্দানুষ্ঠান মাত্র নয়; এটি বাঙালির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে।

১. খ. প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রিয় তার জন্মদিন। এই দিনের সন্ধ্যায় তার প্রিয়জনেরা যদি আয়োজন করে জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকে! জন্মদিনের সন্ধ্যায় আমন্ত্রিতরা যখন একে একে হাজির হয়, শুভেচ্ছা জানায়, স্মারক হিসেবে কিছু না কিছু উপহার হাতে তুলে দেয়, তখন তা মনকে খুশিতে ভরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়। জন্মদিনের গান আর করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে ঘর। সকলের চোখেমুখে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেক কাটার পরে থাকে নৈশভোজ। নৈশভোজে থাকে ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা। সবার জন্মদিনের সন্ধ্যা যে এমন আনন্দের সঙ্গে কাটে, তা নয়। যাদের প্রিয়জনেরা সচ্ছল নয়, তাদের জন্মদিনের সন্ধ্যা হয়তো কোনো রকম আয়োজন ছাড়াই শেষ হয়। তবে আয়োজন হোক বা না হোক, জন্মদিনের সন্ধ্যা মানে জীবন থেকে একটা বছর হারিয়ে যাওয়া আর নতুন একটা বছরের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

২. ক.

৫ই জুন, ২০২...
বরাবর
চেয়ারম্যান
লাকসাম ইউনিয়ন পরিষদ, কুমিল্লা।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্পকারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
নাবিল
লাকসাম, কুমিল্লা।

২. খ. ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২...

ম্যানেজার,
চ্যান্সেলর পাবলিকেশন্স
১৪, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

জনাব

সবিনয় নিবেদন এই যে, পত্র পাওয়ার পর অবিলম্বে আপনাদের সদ্য প্রকাশিত নিম্নলিখিত বইগুলো অনুগ্রহ করে ভিপিপি যোগে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বইগুলো পৌঁছানো মাত্র আমি মূল্য পরিশোধপূর্বক ভিপিপি ছাড়িয়ে নেব ইনশাআল্লাহ।

আপনার বিশ্বস্ত
রাতুল
সিলেট।

বইয়ের তালিকা

১. পরীক্ষা প্রস্তুতি সিরিজ; নবম-দশম শ্রেণি; চ্যান্সেলর সম্পাদনা পর্ষদ; ১ সেট।
২. বিদ্যাভূষণ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা সম্ভার; নবম-দশম শ্রেণি; এস.এম. ফজলুর রহমান; ২টি।

	ডাকটিকিট
প্রেরক রাতুল সিলেট।	প্রাপক ম্যানেজার চ্যান্সেলর পাবলিকেশন্স ১৪, প্যারীদাস রোড, ঢাকা–১১০০।

৩. ক. মাতৃস্নেহ অতুলনীয় এবং সন্তানের পরিপুষ্টির সহায়ক। তবে অতিরিক্ত স্নেহ কখনো কখনো সন্তানের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। ফলে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হতে দূরে সরে যায়।

৩. খ. অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। শত্রুবাহিনীর চরম আক্রোশ ও নির্মমতার শিকার হয়েছে নারী, শিশুসহ আপামর জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে কোনো মূল্যে পরিমাপ করা যায় না।

৪. ক. বিদ্যা ও ধন মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এ বিদ্যা ও ধনের সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে না লাগলে এ দুটোর কোনো মূল্য নেই।

গ্রন্থের সাহায্যে আমরা বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানলাভ করে থাকি। কিন্তু অর্জিত বিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ না শিখলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যা লিখিত আছে। গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করলে তা অর্জন করা যায়। কিন্তু শুধু পুথিগত বিদ্যা কোনো কাজে আসে না। তাকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। পৃথিবীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। পরিশ্রম করলেই তা উপার্জন করা যায়। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম করে তা উপার্জন না করলে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সুদিনে অনেক বন্ধু পাওয়া গেলেও দুর্দিনে কাউকে পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারে প্রচুর গ্রন্থ থাকলেই চলে না। তাদের মধ্যে যেসব জ্ঞানের বিষয় আছে, সেগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে কোনোই প্রয়োজন মেটে না। নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে ধনসম্পদ পরের হাতে তুলে দিলেও প্রয়োজনের সময় ফিরে পাওয়া যায় না। যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদ্যা ও ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তা যদি যথাসময়ে পাওয়া না যায়, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। যে জ্ঞান কোনো ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, সে জ্ঞান দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হয় না; জগতেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। তাই আমাদের উচিত, অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা এবং জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা।

ধন মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। ধন অর্জন করে কেউ যদি অপরের নিকট রেখে দেয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না। তেমনি বিদ্যাও যদি কেবল গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা জীবনের কোনো কাজে লাগে না।

৪. খ. যার বিবেক ও বুদ্ধি আছে সে-ই মানুষ, পশুদের তা নেই। মানুষ নামের যোগ্য হতে হলে তাকে হতে হবে উদার মনের অধিকারী।
আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব সৃষ্টি এ পৃথিবী। অতি যত্নে, মমতায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্ব। এ সৃষ্টি বৈচিত্র্যে তার নৈপুণ্যের অন্ত নেই। বিশ্বজগতে যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী নামে বিবেচিত। জন্মের দিক দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। জন্মের প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য প্রাণীর মতোই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মে। এ বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের জন্য মানুষকে কোনো চেষ্টা যত্ন, সাধনা বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না। কিন্তু মানুষের মধ্যকার মন নামক বিশেষ সত্তাটির জন্যই তাকে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হয়। মানুষ ছাড়া অন্য জীবের মধ্যে যা নেই, তা হচ্ছে মনের অনুভূতি। এ অনুভূতি উদ্ভূত মানবিক চেতনা। এ মানবিক চেতনা অন্য প্রাণীর না থাকায় মানুষের যে মহৎ গুণাবলি অর্জনের সুযোগ ঘটে, তা অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়। মনের কার্যকলাপ থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘটেছে বিকাশ। মানুষের যা কিছু গুণাবলি তার ভিত্তি তার মন। মনের দ্বারাই সে ভালোমন্দ, দোষ, গুণ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করতে পারে। এ মন থেকেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, যার শারীরিক গঠন মানুষের মতো তিনিই মানুষ। এজন্য তাকে অনেক সাধনা করতে হয়। সুন্দর মনের অভাবে মানুষের প্রাণ থাকলেও সে মানুষে পরিণত হয় না। তার অসুন্দর, অমানবীয় ও পশুর মতো আচরণ তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই মানুষের প্রাণে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করার জন্য অনেক পড়াশোনা এবং সাধনার প্রয়োজন হয়।
আমাদের সমাজে অনেক মানুষও পশুর ন্যায় কাজ করে বেড়াচ্ছে। কারণ তাদের প্রাণে যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্ভব ঘটেনি। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, মনের মানুষই মানুষ।

৫. ক.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

তামান্না, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিনজন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ.

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২...
মাননীয়
প্রধান শিক্ষক,
সিলেট জিলা স্কুল, সিলেট।

বিষয় : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার প্রদত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...; স্মারক নং সজস– ২২/২০২... পত্রের আদেশক্রমে বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রদত্ত হলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তি শেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : রাকিব
প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** মানবজীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় ঘটে। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে এমন কিছু খণ্ডমুহূর্ত আসে, যেগুলো স্বতন্ত্র এবং স্মৃতির তালিকায় মোটা রেখায় চিহ্নিত হয়। এক ঝড়ের রাত্রিকে ঘিরে সেরকম রেখাঙ্কিত স্মৃতি আমার জীবনে মহার্ঘ সম্পদ হয়ে আছে। কতবার কতভাবেই তো ঝড় হয়েছে, কালে-অকালে, শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায়, কিন্তু একটি ঝড়ের ভয়ংকর রাত্রি আমার স্মৃতির পটে বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে অনন্য। ২০শে মের কালরাতের কথা আমার মনের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য গেঁথে আছে। এখনো কোনো নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একাকী মনে তার দুঃসহ স্মৃতির ভয়ংকর রূপ প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠি।

স্মরণীয় রজনি ২০শে মে, ২০২... : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, হারিকেন ও মহাপ্লাবনের ধ্বংসযজ্ঞে প্রতিবছর ক্ষতবিক্ষত হয় সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা বাংলা মায়ের কোল। এমনই একটি চিরস্মরণীয় চরম দুঃখের ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ঘটেছিল ২০শে মে রাতে। এটি আমার ক্ষুদ্র জীবনে একটি ভয়াবহ বেদনার ইতিহাস। রক্তাক্ত হৃদয়ের আহাজারি। এই দিন হাতিয়া, সন্দ্বীপসহ চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চল প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এটি ছিল স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়।

ঝড়ের পূর্বাভাস : কিছুদিন যাবৎ আবহাওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ সেদিন সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘের অবাধ বিচরণ। টুকরো টুকরো মেঘ একত্র হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। রেডিও ও টেলিভিশন থেকে ঘোষণা করা হলো বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে, ক্রমে তা ঝড়ের রূপ ধারণ করছে। আস্তে আস্তে এটি উত্তর দিকে অগ্রসর হলো। বিপদ সংকেত ১ নম্বর থেকে বেড়ে ১০ নম্বরে উঠল। সবাই সাবধান। আতঙ্কে সবার বুক দুরুদুরু। যেকোনো মুহূর্তে ভয়াবহ ঝড় উঠে আসতে পারে।

সেই মহাঝড় : মের ২০ তারিখ ছিল অমাবস্যার রাত। সকাল থেকে কালো কালো পুঞ্জীভূত মেঘ পরিগ্রহ করছিল ঘনঘোর রূপ। সারা দিন আকাশে তোলপাড় করে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। আর চলছিল একটানা বর্ষণ। এক অজ্ঞাত দুর্যোগের আশঙ্কায় পথ ছিল জনবিরল। উন্মত্ত বাতাস ও বৃষ্টির প্রতিযোগিতায় সমস্ত শহর জলসিক্ত হয়ে গিয়েছে। সারা দিন কেউ সূর্যের মুখ দেখেনি। মেঘাচ্ছন্ন সারাটা দিন রাতের মতো প্রতিভাত হয়েছিল। রাতের প্রথম প্রহরে শুরু হলো নির্মম, নিষ্ঠুর প্রচণ্ড ঝড়। রাত দশটায় শুরু হলো মহাপ্রলয়ের তাণ্ডবনৃত্য। খোলা জানালা দিয়ে বন্যার জলের মতো হুড়মুড় করে মাতাল হাওয়া ঢুকছে। জানালার কপাট একবার পটপট করে বন্ধ হচ্ছে একবার হা হা শব্দে খুলে যাচ্ছে। সব লন্ডভন্ড, তছনছ করে দিচ্ছে। মনে হলো এ যেন মত্ত মাতঙ্গের সরোষ দাপট। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকারের সীমাহীন সাম্রাজ্য। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গাছপালায় হাওয়ার মাতামাতি। ডালপালা ভেঙে পড়ার মড়-মড়াত শব্দ। ঘরের ভেতরে টেবিলের ওপর ঝনাৎ ঝংকার দেয়ালের ছবিটা পড়ে গেল। ফরফর শব্দে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে। খাতাপত্তরও ছিটকে পড়ছে। প্রাণপণে জানালাটা বন্ধ করার চেষ্টা করি। এক কপাট টানি তো আর একটা ছিটকে যায়। দরজারও একই অবস্থা, এক্ষুনি বুঝি দরজাটা ভেঙে যাবে। হাওয়ার শনশন শব্দ। এরই মধ্যে ওপাশ থেকে বাবার গলা ভেসে এলো, আমিও সাড়া দিলাম। আমাকে বাবার ঘরে চলে যেতে বলছেন। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকাল। সেই ক্ষণিক আলোয় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হলো। চোখে পড়ল কেশরফোলা সিংহের মতো ক্রুদ্ধ আকাশটার ভয়ংকর ক্ষিপ্ত চেহারা। কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। প্রায়শই বাজপড়ার শব্দ শোনা যায়। যেন এক ঝলক আগুন। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। কানে তালা লাগার দশা। অনেক কষ্টে জানালা বন্ধ করলাম। ঘরের ভেতরটা আরও বেশি গমগম করে। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে চমকে উঠি। ঘরের এ কি শ্রী হয়েছে! এখানে ওখানে ছড়ানো সব বই-খাতাপত্তর। ক্যালেন্ডারটা উল্টে গেছে। পানির গ্লাসটা এক কোনায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, জানালার কাচের ভাঙা টুকরো। একটা পাগলা হাওয়া হঠাৎ ঢুকে পড়ে ঘরটা ওলটপালট করে দিয়েছে। লন্ডভন্ড বিধ্বস্ত চেহারা। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার অস্থির ছোটাছুটি বেড়ে যায়। প্রচণ্ড বিক্রমে আছড়ে পড়ছে দরজা-জানালায়। আমার ভেতরেও তখন দারুণ উত্তেজনা। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়া এসে আমার চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনে হলো ওরা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে ওই উন্মত্ত অন্ধকারের বুকে। অন্ধকারের সমুদ্র যেন সহসা উত্তাল, ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জনে ধরণি যেন খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার উপক্রম। ভাবলাম পৃথিবীর বুঝি অন্তিমদশা এসে গেছে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে এক ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবে। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল। কিছু করতে পারছি না। কেবল ঝড় থামার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি।

ঝড়ের এক পর্যায়ে : ঝড়ের এক পর্যায়ে চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল মানুষের আর্তনাদ আর চেঁচামেচি। কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। সেই আর্তকণ্ঠ শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম আমাদের আমগাছটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয়েছে আবার বৃষ্টি। ঘরের ভেতর বন্যার মতো পানি গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাড়ির সীমানাপ্রাচীরের অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে গেছে। ঝড়ের গতি বাড়ছে তো বাড়ছেই। হ্যারিকেনের আলোয় দেখলাম রাত সাড়ে তিনটা বাজে। রেডিয়োর সুইচ টিপলাম। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হচ্ছে বিশেষ বুলেটিন। জানা গেল চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, হাতিয়া, সন্দ্বীপ উপকূল দিয়ে ১৮০ কিলোমিটারের বেশি বেগে বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। উপকূলের মানুষগুলোর কথা মনে হতে ভয়ে শিউরে উঠলাম। ভাবছি এই কি মহাপ্রলয়? সৃষ্টির সবকিছু এমনি করেই কি সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে? আদৌ কি থামবে ঝড়? প্রকৃতি যেন আজ কেবল ধ্বংসলীলায় মেতেছে। সৃষ্টির মধ্যেই কি তবে ধ্বংস অথবা ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি! নানা প্রশ্নবাণে নিজেকে জর্জরিত করতে লাগলাম। দূর থেকে ভেসে আসা মানুষের অস্পষ্ট, ক্ষীণ আকুল আর্তনাদ শুনে মনে হচ্ছিল তক্ষুনি বেরিয়ে যাই। কিন্তু সে মুহূর্তে আমি নিরুপায়, আমরা নিরুপায়। এ বিষয়ে কারও হাত নেই।

ঝড়ের পর : ঘূর্ণিঝড়ের দাপট যখন অনেকটা কম, তখন ঘড়িতে ভোর সাড়ে ৫টা। দরজা খুলে বাইরে বেরুলাম। বাইরে এসে যা দেখলাম, তাতে মনে হলো যেন কাল রাতে প্রকৃতি ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে ওঠে পৃথিবীর বুকের ওপর একটি মহাশ্মশান সৃষ্টি করে গেছে। কত গাছপালা ভেঙে গেছে, কত ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পড়ে আছে বৈদ্যুতিক খুঁটি, টিনের চাল, পাখি, গবাদি পশু, কুকুরের মৃতদেহ। হয়তো অন্য কোথাও মানুষের মৃতদেহও এভাবে পড়ে আছে। এসব ভাবতে ভাবতে আমার মনটা বিষণ্নতায় ভরে উঠল।

উপসংহার : ঝড়ের এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমার আর কখনোই হয়নি। ঝড়ের রাত্রের সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে শিখেছি যে, প্রকৃতির মধ্যে শান্তির যেমন প্রলেপ আছে, তেমনি আছে ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য। শুভ্র জোছনা-পুলকিত যামিনী দেখে কখনো ভাবতে পারি না যে, তার অন্তরালে তমসাময়ী ঝটিকাক্ষুব্ধ রাত্রি লুকানো রয়েছে। এক প্রকৃতিরই দুটি রূপ প্রত্যক্ষ করলাম। সেই ঝড়ের রাত্রির নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার মনে আজও দুঃস্বপ্নের স্মৃতি হয়ে আছে।

৬. খ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করত। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক, যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে, তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,

২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,

৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

৬. গ. **ভূমিকা :** অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোক্তা। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বেকারত্ব– এ সবকিছুর ভিতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা : কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে।

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ : শস্য, প্রাণিসম্পদসহ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, পরিবহণব্যবস্থা, বাজার ও চাহিদা উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরুম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গরু–ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণিসম্পদের লালন-পালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কৃষি উদ্যোক্তার করণীয় : একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত :

ক. উদ্যোক্তাকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।
খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
গ. একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারণ, তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।
ঘ. কৃষি খাতে উদ্যোক্তাকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।
ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা জরুরি। উপযুক্ত খাবার, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।
চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এত বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।
ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ : কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :

ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ প্রদান করছে।
খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্যসম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষিসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি দ্রব্যাদির বাজারদর, কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, সাপ্তহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

উপসংহার : একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে।

মডেল টেস্ট- ০৬

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	গ	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	খ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ক

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গাণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গাণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গাণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। ভারতের গঙ্গা নদীর ধারা বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময়ে পদ্মা নাম গ্রহণ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীতে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি পদ্মা নামে পরিচিত। উৎপত্তি ও প্রবাহ বিবেচনায় পদ্মা আন্তর্জাতিক একটি নদীর অংশবিশেষের নাম। মূল নদীটির নাম গঙ্গা। গঙ্গা নদীর উৎস হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ। বাংলাদেশে প্রবেশের সময়ে গঙ্গার দক্ষিণমুখী একটি শাখা ভাগীরথী নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে সাগরে মেশে। মূল ধারাটি পদ্মা নাম নিয়ে গোয়ালন্দের কাছে পৌঁছানোর পর সেখানে উত্তর দিক থেকে আসা যমুনা নদী তার সঙ্গে মেশে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর সর্বোচ্চ গভীরতা দেড় হাজার ফুটের বেশি এবং গড় গভীরতা প্রায় এক হাজার ফুট। মালদহ জেলার ফারাক্কাবাদে পদ্মা নদীর সূচনায় একটি বাধ দিয়ে ভারত সরকার পদ্মা নদীর পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পদ্মা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে একাধিক রেল ও সড়ক সেতু : একটি ঈশ্বরদীর কাছে এবং অন্যটি মাওয়ার কাছে। পদ্মা নদীর ইলিশের স্বাদ বিশ্বজোড়া। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অন্যতম উপাদান হিসেবে পদ্মা নদীর নাম উচ্চারিত হতো।

২. ক.

১৫ই নভেম্বর, ২০২...
স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ।

শ্রদ্ধেয় আম্মাজান,
আমার ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। আশা করি বাড়ির সকলকে নিয়ে ভালো আছেন। বাবা, আমাদের পরীক্ষা দরজায় করাঘাত করছে। আমিও পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। ইংরেজি ও গণিতে আমার প্রস্তুতি কিছুটা কম ছিল। আমাদের ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদ্বয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও ঔদার্যে উক্ত বিষয়গুলোতেও আমার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অতএব আসন্ন পরীক্ষার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বাকি আল্লাহর অনুগ্রহ ও আপনাদের দোয়া।
পরীক্ষায় যেন আমি ভালো ফল করে আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি, সেজন্য বিশেষভাবে দোয়া করবেন। আমি পুরোপুরি সুস্থ। আশা করি আপনাদের কুশলাদি জানিয়ে পত্র দিবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
নিখিল

[**বি. দ্র. :** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ. ঐতিহ্যবাহী মাগুরা জিলা স্কুলের ২০২... সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষ্যে অশ্রুসিক্ত বাণী

কবির ভাষায়–
উড়ে এসেছিলাম জ্ঞানের বাগানে
মোরা পথভোলা বুলবুল।
উড়ে যাই আবার জীবন-সংগ্রাম নীড়ে
আশঙ্কা বেদনায় হৃদয় ভাঙা ব্যাকুল।

হে বিদায়ী বন্ধুরা,
চমৎকার সুন্দর নীলচে আকাশে শারদীয় মেঘ, শিউলিঝরা প্রভাত আর কুয়াশার শুচি-শুভ্র উত্তরীয় প্রকৃতি যখন অনিন্দ্যসুন্দর, তখন শেষ হয়ে এলো তোমাদের জীবনের শিক্ষাকাল। তোমাদের বিদায় রাগিণীতে আমাদের মনের সোনালি আকাশ ছেয়ে গেছে বিষাদের ছায়ায়।

হে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ,

বাঙালি কৃষ্টি, সভ্যতা আর ঐতিহ্যচেতনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রালগ্ন থেকেই জ্ঞানপিয়াসী কত না মনীষী, সুধী-জ্ঞানী-গুণী দিয়েছ বিদায় তোমার এই অনন্ত সুবাসিত কুসুমকানন হতে। একবিংশ শতাব্দীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সিন্ধু মাঝে আমরাও আজ রিক্ত হস্তে দিচ্ছি পাড়ি মহাকালের যাত্রাপথে। তাই আমরা আজ আশঙ্কিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবন্ধ– জ্বালিয়ে দেব সকল কুসংস্কারের আস্তানা।

হে বিদায়ী অগ্রজবৃন্দ,

বেদনাবিধুর এ বিদায় বেলায় আমাদের মনে পড়ছে বিগত দিনের অফুরন্ত স্মৃতি। সুদীর্ঘ সময়ে তোমাদের সাথে আমাদের হৃদ্যতার যে নিবিড় সম্পর্কের গ্রন্থি রচিত হয়েছিল, তা আজ ছিন্ন করে আমাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে তোমরা চলে যাচ্ছ। তবু শিক্ষার এ ক্ষুদ্রতর সীমার বাঁধন পেরিয়ে উচ্চতর এক শিক্ষাজীবনের সন্ধানে যাত্রা করছ ভেবে আমাদের মনে বেদনার মাঝেও কিছুটা আনন্দের ধারা বহমান।

হে সুহৃদ বন্ধুগণ,

জানি, তোমাদের যথাযথ সম্মান আমরা দিতে পারিনি। অনেক সময় আমাদের অবুঝ যুক্তিতর্ক, আচার-ব্যবহারে তোমরা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছ। আজ এ বিদায়লগ্নে করজোড়ে তোমাদের আকাশসম হৃদয়ের কাছে আমরা ক্ষমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। আশা করি ক্ষমা করে দেবে।

তোমাদের নতুন যাত্রাপথ সাফল্যময় হোক। পূর্ণ হোক মনের সকল মঙ্গল বাসনা।

তোমাদের স্নেহমুগ্ধ

শিক্ষার্থীবৃন্দ

মাগুরা জিলা স্কুল, মাগুরা।

৭ই নভেম্বর, ২০২...

৩. ক. জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

৩. খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীকে অপরূপ করেছে। প্রকৃতি মানুষের মনকে পুলকিত করে; আবার প্রকৃতির প্রেমে মানুষের মন বাঁধা পড়ে। এই মায়া ত্যাগ করে কেউই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায় না।

৪. ক. অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমান অপরাধ। অন্যায়ভাবে শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান হওয়া যেমন দোষের, তেমনি অন্যায় সহ্য করার মানসিকতাও সমভাবে নিন্দনীয়।

সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত এই অলিখিত কর্তব্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটলে মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু এই মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতা বা সাহস সকলের সমান হয় না। ফলে কিছু লোভী, পরশ্রীকাতর ও অত্যাচারী মানুষ দুর্বলের ওপর নির্যাতন করার সাহস পায়। অন্যায়কারীরা নিজের হীন ইচ্ছাকে বীরভোগ্য বসুন্ধরা বা Might is right ভেবে তৃপ্ত হয়। 'জোর যার মুল্লুক তার'– এই মনোভাবে বিশ্বাসীরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর চড়াও হয়– সুখশান্তি ব্যাহত করে, নির্যাতন চালায়, সম্ভ্রম ও শ্লীলতাহানি করে। কেন তারা এমন করতে পারে? বস্তুত কিছু মানুষের নীরবতা, উদাসীনতা, কাপুরুষতা, পৌরুষহীনতা পরোক্ষভাবে মদদ জোগায় অন্যায়কারীদের। যদি সমস্ত ভয় ভেঙে দুর্বলের দল, নিস্পৃহের দল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতো– তবে অন্যায়কারী পিছু হঠতে বাধ্য হতো। সেক্ষেত্রে অন্যায় কখনোই সংঘটিত হতে পারত না।

মূলত অন্যায়কে সহ্য করা, প্রকারান্তরে অন্যায়কে সমর্থন করা। তাই যে অন্যায় করে সে যেমন পাপী; যে অন্যায় কার্যকে সহ্য করে, সে-ও তেমনি পাপী ও ঘৃণ্য।

৪. খ. পৃথিবীতে যার জীবন পুণ্য কর্মময়, তার জন্ম যে বংশেই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি মর্যাদাবান। অপরপক্ষে জীবন যার গ্লানিময়, জন্ম তার যে বংশেই হোক না কেন সে মর্যাদাহীন হিসেবে গণ্য।

সকল মানুষই আদি পিতা আদমের সন্তান। সুতরাং একজন মানুষ অন্যজন অপেক্ষা কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। তথাপি আমাদের বর্তমান সভ্য সমাজে আশরাফ ও আতরাফ তথা ভদ্র ও অভদ্র দুটি কথার প্রচলন রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে একই আদম সন্তান হিসেবে এটি সম্পূর্ণ অমূলক ও নিরর্থক। আমাদের সভ্য সমাজে এরূপ কৌলীন্য প্রথা মানুষের মাঝে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি এবং সমাজবদ্ধ মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করেছে। বংশ বা গোত্র বলে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই। গোত্র বা বংশ সব মানুষেরই এক অর্থাৎ আদম গোত্র। এখানে কৌলীন্যের কিছুই নেই। তবে কৌলীন্য তারই থাকবে, যার মধ্যে মানবতার মহৎ গুণ বিদ্যমান। মানুষের এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যই কবি বলেছেন, উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণই মানুষের যথার্থ পরিচয় নয়। তার সত্যিকার পরিচয় তার কর্মের মাঝে। পৃথিবীতে যারা সৎকাজ করে তারাই কৌলীন্যের দাবিদার হতে পারে। আর যারা সমাজের অকল্যাণে প্রবৃত্ত থাকে, যত উচ্চ বংশে অথবা বিত্তশালী বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তারা কখনো কুলীন বা সম্ভ্রান্ত হওয়ার দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) তদানীন্তন আরব দেশের এরূপ মিথ্যা কৌলীন্য প্রথা রহিত করার জন্য তাঁর বিদায় হজের ভাষণে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাছাড়া পৃথিবীতে মহাজ্ঞানী মাত্রই মিথ্যা কৌলীন্যকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন।

সুতরাং নাম বা বংশপরিচয় কাউকে বড়ো করে না। বড়ো করে তার কর্ম। কর্মই মানুষের আসল পরিচয়। মানুষের প্রকৃত কৌলীন্য তার বংশমর্যাদার ওপর নির্ভর করে না; বরং এটা নির্ভর করে তার সৎকর্মের ওপর।

৫. ক.

২৫শে জানুয়ারি, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ।

বিষয় : স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন।

সূত্র : ম.জি.স, ২০২.../২/(২৮)

মহোদয়,

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ২০২... সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা	:	তৌসিফ আহমেদ, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়	:	২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

শেরপুরে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

ফাহাদ, শেরপুর প্রতিনিধি, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের ফুটবল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলা প্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৬. ক. **ভূমিকা :** বাংলার মুসলিম নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুক্তমনা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মহল্লায় মহল্লায় ছাত্রী সংগ্রহ করে নারীশিক্ষা বিস্তারে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি শুধু সমাজসেবিকাই নন, বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পীও বটে। সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী গদ্য রচনাও তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল।

জন্ম ও বংশপরিচয় : ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মুহম্মদ আবু আলী সাবের। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এ পরিবারে পর্দাপ্রথা এত কঠোর ছিল যে, মহিলারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাকরানি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে যেতে পারতেন না।

শিক্ষাজীবন : রোকেয়ার সময় মুসলমানগণ অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ইংরেজি শিক্ষার নামে তারা শিউরে উঠত, নারীশিক্ষাকে তারা মহাপাপ মনে করত। এরূপ এক তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে বেগম রোকেয়ার জন্ম। রোকেয়ার পিতাও সমাজের কুসংস্কার হতে মুক্ত ছিলেন না। এ কারণেই রোকেয়াকে কুরআন শরিফ ছাড়া আর কিছুই পড়তে দেওয়া হয়নি। বেগম রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। রোকেয়ার বড়ো ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাবের তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। গভীর রাতে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে বালিকা রোকেয়া মোমবাতির আলোতে বড়ো ভাইয়ের কাছে ইংরেজি ও বাংলা পড়তেন। শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও এভাবে দিনের পর দিন তাঁর শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দেখে ভাইও তাঁকে যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। আর এ সময়েই বেগম রোকেয়ার মনে মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতি কীভাবে দূর করা যায়, সেই ভাবনা জন্ম নেয় এবং এক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন সহযোগিতা করেন।

বৈবাহিক জীবন : বিহারের ভাগলপুরে রোকেয়ার বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাঁর সাহায্যে বেগম রোকেয়ার শিক্ষার ক্রমোন্নতি হয়। নিজে শিক্ষালাভ করেই বেগম রোকেয়া থামলেন না, তিনি বাংলার মুসলিম নারীদের দুর্দশাও লক্ষ করলেন। বুঝলেন, শিক্ষার বিস্তার না হলে তাদের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত হলেন।

কর্মজীবন : নিয়তির কী পরিহাস, বিয়ের নয় বছর পর ১৯১১ সালে রোকেয়াকে নিঃসন্তান অবস্থায় রেখে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন পরলোকগমন করেন। সংসারের বাঁধন হতে মুক্ত হয়ে বেগম রোকেয়া নারী জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মনস্থ করেন। সে অনুযায়ী রোকেয়া শ্বশুরালয় ভাগলপুরে একটি স্কুল খুলে শিক্ষাদান করার চিন্তা করেন। কিন্তু স্কুল খোলায় নানারকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে স্বামীর প্রদত্ত শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে স্কুল স্থাপিত হলো। রোকেয়া নিজেই স্কুলের ছাত্রীদের পড়াতে লাগলেন। কিন্তু অনেক বাধাবিপত্তি তাঁকে মোকাবিলা করতে হলো। বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে, শত বিদ্রূপ-অপমান সয়ে তিনি স্কুলের জন্য সংগ্রাম করে চললেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে তাঁর সাধনা সফল হলো। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল একটি প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হলো। এছাড়াও রোকেয়া সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকাতায় ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।

সাহিত্যিক রোকেয়া : কর্মী রোকেয়া যত বড়ো, সাহিত্যিক রোকেয়া আরও বড়ো ও খ্যাতিমান। রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল তাঁর কর্মশক্তির অপূর্ব নিদর্শন। স্কুলের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি 'মতিচূর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি বই রচনা করেন। তাছাড়া তিনি 'সুলতানার স্বপ্ন' (Sultana's Dream) নামক একখানা ইংরেজি বইও রচনা করেন। তাঁর রচিত বইগুলো বাংলার মুসলিম নারী জাগরণে এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত। তিনিই বাংলাদেশের মুসলিম নারী আন্দোলনের জন্মদাত্রী ও পথিকৃৎ।

উপসংহার : ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মহীয়সী রমণী পরলোকগমন করেন। বেগম রোকেয়া নারী-মুক্তির দূত হয়ে এসেছিলেন। মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতির কথা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই বাংলার নর-নারী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। কারণ রোকেয়ার কীর্তি অমর– তাঁর স্মৃতি অক্ষয়।

৬. খ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর

কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরতাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় খাত। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জনগণের উদার আতিথেয়তা এ শিল্পের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যপিপাসাকে নিবৃত্ত করে। এমন পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পর্যটনশিল্প। কিন্তু বাংলাদেশে এ শিল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি নেই। অথচ পর্যটনশিল্পে এদেশে অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে।

পর্যটনের পরিচয় : প্রাচীনকালে মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন। সেসময়ে যোগাযোগব্যবস্থা খুব কষ্টকর ও দুর্গম থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণপিপাসুরা ঘুরে বেড়িয়েছেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি এসব বিখ্যাত পর্যটকের অনেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিলেন। আজ পর্যটন পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মানুষের অদেখাকে দেখার অভিপ্রায় থেকেই।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন : একসময় বাংলাদেশ পর্যটনশিল্পে বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন শাসক-শোষক শ্রেণির কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের হারিয়ে যাওয়া পর্যটনশিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৪৩নং আদেশবলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্যোগ সূচিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ১৯৭৫ সালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশসাধন করা। এর ফলে এ শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা যাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। খাতটি নানাভাবে এদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্পের অবদান অতুলনীয়। পর্যটন কর্পোরেশন মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার

মধ্যে একটি। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটনশিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল এবং পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-বিদেশে কর্মরত রয়েছে।

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে। দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে এদেশের আর্থিক সমৃদ্ধি এনেছে। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে, যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের আমাদের দেশটি যেন প্রাকৃতিক এক মিউজিয়াম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দৃষ্টিনন্দন এদেশটি যুগে যুগে তাই অনেক কবি-লেখক তৈরিতে সহায়ক হয়েছে এবং বিখ্যাত পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে।

বাংলাদেশের অনুপম নিসর্গ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন কেন্দ্রগুলো। এসব অনুপম নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগের জন্য বাংলাদেশ যুগে যুগে হাতছানি দিয়েছে কাছের ও দূরের ভ্রমণপিপাসুদের। তারা অবাক হয়ে এদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। অনেকেই তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় প্রশস্তি গেয়েছেন বাংলাদেশের মনোলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। তাই বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধ একজন পর্যটক বলেছেন– বাংলাদেশে প্রবেশের হাজার দুয়ার খোলা রয়েছে কিন্তু বেরুবার একটিও নেই।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দেশে ক্রমান্বয়ে বিদেশি পর্যটক এবং পর্যটন খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়ে চলেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দ্য নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন' অনলাইনে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় শীর্ষ দশ স্থানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত 'কক্সবাজার' ও বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবন'।

বাংলাদেশের পর্যটন স্পট : ভ্রমণের নেশা মানুষের স্বভাবগত। প্রকৃতি যে অন্তহীন সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসে আছে, একমাত্র দেশভ্রমণের ফলে তা পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে অবাধ চলার সুযোগ করে দিয়েছে বলেই মানুষ খুব সহজেই দেশ-দেশান্তরের দর্শনীয় স্থানগুলো উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় দেশ। বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল প্রাকৃতিক শোভা সত্যিই নয়নাভিরাম। তাছাড়া কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই উপভোগ করা যায় কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে। ঐতিহাসিক পর্যটন নিদর্শন হিসেবে খ্যাত মহাস্থানগড়, রামসাগর, সোনারগাঁ, লালবাগ দুর্গ, কান্তজীর মন্দির প্রভৃতি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত রাঙামাটি, বান্দরবান, কাপ্তাই হ্রদ, মহেশখালী, সুন্দরবন, জাফলং প্রভৃতি পর্যটন স্পট রয়েছে।

পর্যটন কেন্দ্রগুলো আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকারি উদ্যোগ : বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে গতিশীল ও আকর্ষণীয় করার জন্য এবং স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলো সুপরিচিত ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার এক্সক্লুসিভ জোন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের পর্যটনশিল্পকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য একটি খসড়া নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইনানী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপের উন্নয়নে মাস্টারপ্লানের কাজ চলছে। কুয়াকাটা পর্যটনকেন্দ্রের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ওই এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের পর্যটনশিল্প বিপুল সমৃদ্ধি বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার : বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প এক অভাবনীয় উন্নয়নের সোপান। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পকে আরও উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি আমরা বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারি। আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এদেশের পর্যটনশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে– এটাই আজকের প্রত্যাশা।

মডেল টেস্ট- ০৭

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	ঘ	৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ	২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক

রচনামূলক

১. ক. একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এ স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি এখন বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক দিন এটি। দিবসটির রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ক্ষমতালিপ্সু পাকিস্তান সরকারের হীন মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ "Urdu and urdu will be the only state language of Pakistan." ঘোষণা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানে আত্মপ্রত্যয়ী ছাত্রসমাজ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশের উদ্দেশে যাত্রা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না-জানা অনেকে শহিদ হন। অবশেষে ছাত্রজনতার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিস বৈঠকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক শাখা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবসরূপে ঘোষণা করে। শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে স্মরণ করে ইউনেস্কোর এই ঘোষণা বাঙালির আরেক বিজয়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে প্রথম 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আর এভাবে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত।

১. খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচিত্র বন্য প্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি বন্য প্রাণী। বিচিত্র প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২. ক. ২৪শে জুলাই, ২০...

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
আয়নাপুর উচ্চ বিদ্যালয়

বিষয় : 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ১৬ই জুন, ২০২... তারিখে দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, অত্র বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করছি। নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ প্রয়োজনীয় জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করা হলো :

১. নাম : সুমাইয়া আক্তার
২. পিতার নাম : মো. শামসুদ্দিন আহমেদ
৩. মাতার নাম : বেগম হাফিজা খাতুন
৪. স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : মুন্সীবাড়ি, গ্রাম : ডুমুরখালি, পোস্ট : ঝিকরগাছা, জেলা : যশোর।
৫. জন্মতারিখ : ২৮শে মে, ১৯৯৮
৬. জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৭. ধর্ম : ইসলাম
৮. শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ :

পরীক্ষার নাম	পাসের বছর	বিভাগ	জিপিএ/শ্রেণি	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এসএসসি	২০১৪	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	যশোর বোর্ড
এইচএসসি	২০১৬	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	যশোর বোর্ড
স্নাতক	২০১৯	মানবিক	দ্বিতীয়	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অতএব, উপর্যুক্ত তথ্যাবলির আলোকে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে অত্র বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করলে বাধিত হব।
বিনীত নিবেদক
সুমাইয়া আক্তার
সংযুক্তি :
১. সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি– তিন কপি
২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ– দুই কপি
৩. সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি– তিন কপি।

২. খ. ২০শে অক্টোবর, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
বিনীত
ফাহিম
লোহাগড়া, নড়াইল।

আমাদা বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির প্রতি নজর দিন

নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানাধীন আমাদা বাজারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোহাগড়াসহ আশপাশের প্রায় দশ গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে আসছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিল্ডিংগুলো পুরানো ও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ নেই। আউটডোর, ইনডোর মিলিয়ে পাঁচজন ডাক্তারের পদ শূন্য হয়ে আছে। সামান্য ঔষধপত্র যা আসে, তারও ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার কেউ নেই। এভাবে সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, কোনো রোগীর প্রতি সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসাটি প্রয়োগ না করার ফলে তার মৃত্যুও ঘটেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দুরবস্থা থেকে উন্নতি না হলে গ্রামের মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
এ পরিস্থিতিতে এলাকার জনগণের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরিয়ে আনতে এবং জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির মান উন্নত করে ও সংস্কার করে সেখানে উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, এ ব্যাপারে যেন আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
নিবেদক
গ্রামবাসীর পক্ষে
ফাহিম

৩. ক. বিদ্যার চেয়ে বড়ো সম্পদ আর নেই। তবে তার চেয়েও বড়ো সম্পদ চরিত্র। চরিত্রহীন মানুষ যত বড়ো বিদ্বান হোক না কেন, সে পশুর চেয়ে অধম। তার থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

৩. খ. শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রম ও অপরিসীম ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তারাই সত্যিকারের মহৎ মানুষ। কিন্তু বাস্তবজীবনে এরা বঞ্চিত, শোষিত ও উপেক্ষিত। এখন দিন এসেছে। শ্রমজীবী মানুষেরাই একদিন নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পালাবদলের সূচনা করবে।

৪. ক. ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সবকিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।
প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সবকিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারা দিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়োজোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।
ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের সুধা তার কাছে অর্থহীন।

৪. খ. সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে। ধৈর্য ও সহনশীলতা মানুষকে অন্তরের শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। সেই শক্তি মানুষকে সমস্যা মোকাবিলায়, প্রতিকূলতা অতিক্রমে উজ্জীবিত করে তোলে।

দুনিয়াতে মানুষের জীবন চলার পথ বড়োই দুর্গম। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। রোগশোক, দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ও হতাশা এসবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনকি মাঝে মাঝে বাঁচার ইচ্ছাও হারিয়ে ফেলে, কিন্তু ধৈর্যের শক্তিতে মানুষই পারে প্রত্যাশার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে সকল কিছুকে জয় করতে। সেই জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, শক্তি, সাহস, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। এ গুণগুলো না থাকলে মানুষ জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে পারবে না। জীবনের চলার পথে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও যাতনা সহ্য করতে হতে পারে। কিন্তু এতে ধৈর্য হারালে চলবে না; বরং এসবই জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই অপরিসীম ধৈর্য বা সহনশীলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে। দুঃখ-শোকের তীব্র আঘাতেই মানুষের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত হয়; পৃথিবীকে নতুন করে উপলব্ধি করতে শেখায়। জীবন ঘষে যে স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তাতে মানবজীবনকে চেনা যায় নতুন করে। কিন্তু জীবনযুদ্ধের এ প্রতিকূলতাকে ভয় পেয়ে বসে থাকলে জীবনে সাফল্য অর্জিত হয় না। সীমাহীন ধৈর্যে যারা জীবনের সকল তিক্ততাকে অমৃত বলে গ্রহণ করতে পেরেছে, তারাই সার্থক জীবনের অধিকারী। এ ধৈর্য, সহনশীলতার শক্তিতে জ্ঞানী-গুণী ও মহামানবরা পৃথিবীর বুকে দুঃখ ও বিপদ জয়ের অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

মানবজীবনের সফলতা অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি হলো ধৈর্য। আর ধৈর্যহারা লোক বৃহৎ জগতে বাঁচতে শেখেনি। সহনশীলতা তথা ধৈর্য মানবজীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অপরিসীম শক্তি আর সাহস জোগায়। সুতরাং জীবনে সাফল্য অর্জনে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।

৫. ক. **সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ**

তামান্না, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিনজন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ. **চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২..... ॥ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন– বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিনজন করে মোট ছয়জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

৬. ক. **ভূমিকা :** বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসে এক মাইলফলক স্বাধীনতাযুদ্ধ। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই ১৯৭১ সালে। রক্ত, অশ্রু, আর অপরিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক মহান বিজয়গাথা।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা : গণ-আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণানুযায়ী ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩৯০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : ইয়াহিয়া খানের পহেলা মার্চের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনতা হতবাক হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন–

- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে।
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ আহ্বানে সকল অফিস আদালত, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

আলোচনার নামে প্রহসন : ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ দশ দিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ আলোচনা ছিল প্রহসন মাত্র। এ বৈঠকের আড়ালে তারা কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে থাকে।

তীব্র আন্দোলন শুরু ও গণপ্রতিরোধ : আলোচনার নামে এরূপ প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এ আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমন্ত জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকা শহর ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথেই সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়।

অস্থায়ী সরকার গঠন : ১০ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা মুজিবনগরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয় এবং ১৭ই এপ্রিল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গণপরিষদ সদস্য ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরকেই মুজিবনগর নাম দিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয় : অস্থায়ী সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এদেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক-বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তারা পাকবাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাপ্তি : পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো এদেশের মানুষ ঘুমায় পথের ধারে, এখনো মানুষ মরে অনাহারে, এখনো জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়, মসজিদের ইমামকে গুম, হত্যা করা হয়, মন্দিরের জমি-জায়গা দখল করা হয়। এখনো মানবাধিকার লজ্জিত হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কবলে পড়ে দেশবাসী আজ বড়ো অসহায়। আর এসবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন : প্রথমত বাংলাদেশের তরুণ যুবকদের সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এরপর জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে রূপরেখা তুলে ধরতে হবে। শিক্ষা-কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ এর নানাবিধ ঘটনা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সমস্ত গণমাধ্যমে এ চেতনা বাস্তবায়নে জনমত তৈরি করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে এই মহান আদর্শকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, বরং সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে অন্তত এই বিষয়ে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনকি সমাজকাঠামোতে যে দুর্নীতির রাহুগ্রাস বর্তমান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তার মূলোৎপাটনে এগিয়ে আসতে হবে। লাখো শহিদের রক্তের মর্যাদায়, শত-সহস্র মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে।

আমরা লাখো প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠুক এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় কবির এ কবিতায়–

'স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।'

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়। এ অধ্যায় বড়ো উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেদনা ও আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বাঙালির সত্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেতনা জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতার এত দিন পরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য দলমত-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

৬. খ. **ভূমিকা :** মানবজীবনে সময়ানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে, সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত, তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে– এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না, তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইনশৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. গ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যা-পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূ কম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতিবছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূ ষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি, তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

মডেল টেস্ট- ০৮

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	ঘ	৩	গ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক

রচনামূলক

১. ক. জাদুঘর বলতে এমন স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করা হয়। অতীত কালের গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করাই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত জাদুঘরগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের ল্যুভর ও গিমে মিউজিয়াম, ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইতালির উপিজি মিউজিয়াম, রাশিয়ার হার্মিটেজ মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য। ঢাকার শাহবাগে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো জাদুঘর অবস্থিত। এর নাম বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। সুদূর অতীত থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ধরনের পুরাকীর্তি এখানে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিজড়িত বাসভবনে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর ইত্যাদি। জাদুঘরের পুরাকীর্তিসমূহ নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। যে জাতির ঐতিহ্য যতো সমৃদ্ধ, সে জাতির জাদুঘরও ততো সমৃদ্ধ।

১. খ. এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিষ্কারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্টফোন। এই স্মার্টফোনে কথা বলা যায়, খুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিও শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২. ক.

২৫শে মে, ২০২...
পীরগাছা, রংপুর।

প্রিয় রায়হান,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। রংপুর থেকে বেশি দূরে নয় বলে পৌঁছাতে সময় লাগল না। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
রাজিব

[**বি. দ্র. :** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ.

২০শে মে, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
সালনা উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর।

বিষয় : অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। গত ১৫ই মে থেকে ১৯শে মে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত থাকায় আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, মহোদয় সমীপে সদয় প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত পাঁচ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।
বিনীত
আপনার অনুগত ছাত্রী
জান্নাতুল ফেরদৌসী
দশম শ্রেণি, ক্রমিক নং-২

৩. ক. মানুষকে বড়ো করে তোলাই সমাজের কাজ, তাকে বিকশিত করাও তার লক্ষ্য। কিন্তু স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তারা প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ পায়নি; বরং অহংকাররূপ দেবতার হাতের পুতুল। এই অহংকার ব্যক্তি থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

৩. খ. ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মানুষকে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় পথ অতিক্রম করতে হয়। দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে লড়াই এবং বিপদকে মোকাবিলা না করে জীবনে সাফল্য অর্জিত হয় না।

৪. ক. হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। দুঃখের সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। কেননা দুঃখের পরেই আসে সুখ। দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবে এটাই স্বাভাবিক।
জগৎ-সংসারে মানুষ সর্বদাই সুখের কাঙাল, মানুষের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তই সুখের হয়ে উঠুক এটাই প্রার্থিত। দুঃখকে পরিহার করার সংগ্রামেই মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখ অর্জনের জন্য কষ্টের প্রয়োজন। আর এই কষ্টই হলো দুঃখকে বরণ করে নেওয়া। আর এ দুঃখের রজনি যতই গভীর হয় সুখের অভ্যুদয় ততই নিকটবর্তী হয়ে আসে। পতঙ্গ আনন্দ বিহারে যতই ঊর্ধ্ব গগনে উড়তে থাকে, ততই এর পতনের মুহূর্ত নিকটবর্তী হতে থাকে। দুঃখের রাত্রি পার হয়েই আসে আনন্দঘন সুপ্রভাত। সুখ মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই সুখের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখ হতেও যে অমৃত লাভ করা যায়, মানুষ তা অনুভব করে না। বাস্তব জীবনেও দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজন আছে। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পতিব্রতের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্ত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে, মানুষ নতুনতর মহিমান্বিত জীবন লাভ করে। সুতরাং দুঃখের পথ বেয়েই আসে সুখ শান্তির আয়োজন। মেঘ যতই গভীর ও ঘনতর হয়ে আসুক না কেন, সূর্যকে গ্রাস করার বা অবলুপ্ত করার মতো ক্ষমতা তার নেই। মেঘ সব সময় থাকে না। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হেসে উঠবেই। পতনোন্মুখ তরঙ্গও আবার পরক্ষণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অমাবস্যার যে অন্ধকার চাঁদকে সাময়িকভাবে গ্রাস করেছে, তার পরদিনই হেসে ওঠে নতুন চাঁদ। শীত চিরস্থায়ী নয়। শীতের পর বসন্ত আসবেই।
সুতরাং মানুষকে দুঃখরূপ কালো মেঘের ঘনঘটায় ভেঙে পড়লে চলবে না, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসে তার মোকাবিলা করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের কালো মেঘ কেটে এক সময় সুখের সোনালি সূর্য হেসে উঠবেই।

৪. খ. জ্ঞান আহরণ করার আশা নিয়ে মানুষ বই কেনে। আর এই বই কেনার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হয়, অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় তা খুব নগণ্য।
বই মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে মনের জগৎকে প্রসারিত করে। কূপমণ্ডূকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের সূচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দার্শনিকগণ বলেছিলেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের সীমানা বাড়াতে, বুদ্ধিকে বন্ধনহীন করতে, আর মানুষের মুক্তি আনতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সব মানুষই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার আরও অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপায়– বই কেনা। বই কিনে কেউ নিঃস্ব হয় না। কারণ, একটা বইয়ের অর্থমূল্য বেশি নয়। বরং একটি বই কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অনেকে অন্যান্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ব্যক্তিকে আলোকিত করতে একটি বই যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বোকামি। একটা বই অনেক সময়ে মানুষের জীবনকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে।
বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বই কেনার ও তা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

৫. ক.
২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২...
মাননীয়
প্রধান শিক্ষক,
সিলেট জিলা স্কুল, সিলেট।
বিষয় : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।
জনাব,
আপনার প্রদত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...; স্মারক নং সজস– ২২/২০২... পত্রের আদেশক্রমে বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রদত্ত হলো।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।
সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির

অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তি শেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।
বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : রাকিব
প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৫. খ. **চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২..... ॥ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন– বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিনজন করে মোট ছয়জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

৬. ক. **ভূমিকা :** ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনই ভাষা-আন্দোলন, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরও আগে, অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা-আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একই সঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা-আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমন্ত্র।

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ– পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকারসংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ পালিত সেই ধর্মঘটে পিকেটিংয়ের সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন, 'উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয়, বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সমমর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে।

ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরও অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে। শহিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলন : ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে ওই দিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম শামসুদ্দীন।

ভাষা-আন্দোলনের অর্জন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা-আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে 'কবর' নাটক রচনা করেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লেখেন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী; শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশকে নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে চর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন- সংগ্রাম হয়েছে, তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা-আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি। ভাষা-আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনো সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার : একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা-শহিদদের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তবে তাঁদের আত্মদান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

৬. খ. **ভূমিকা :** গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্য সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিষ্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে, তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মতনির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যেকোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. গ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরতাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

মডেল টেস্ট- ০৯

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	গ	৩	ক	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গাণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গাণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গাণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক দেশপ্রেমমূলক গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির সূচনায় বা জাতীয় দিবসসমূহ পালনের সময়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন সকালের সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময়ে সমবেত সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হয়। এটা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সামিল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলা শুরুর আগেও প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন: 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাউল গানের সুরে গানটি রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গানটির কথায় বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় সংগীত দেশের মানুষকে নিজ দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়।

২. ক.

১০ই জানুয়ারি, ২০২...
মতিহার, রাজশাহী।

প্রিয় রফিক,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজ আমি তোমাকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পত্র লিখতে বসেছি। আর সেটি হলো পাঠাগারে বই পড়ার উপকারিতা।

পাঠাগারে বই পড়ার উপকারিতা অত্যন্ত অপরিসীম। কারণ পাঠাগারে বিভিন্ন ধরনের বই থাকে। আর বই হলো জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হওয়ার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের মেধা ও মননশীলতার সুষ্ঠু বিকাশ সাধিত হয়। এমনকি বই পড়ার মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়া যায়। পাঠাগারে বই পড়ে আমরা যতটা সহজে জ্ঞানার্জন করতে পারি তা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। এজন্য আমি নিয়মিত পাঠাগারে গিয়ে বই পড়া শুরু করেছি। তুমিও আর দেরি না করে পাঠাগারে বই পড়া শুরু করে দাও। পাঠাগারে বই পড়ার মাধ্যমে তোমার সৃজনশীল মেধা বিকশিত হোক এ প্রত্যাশাই কামনা করছি।

তোমার বাবা-মাসহ পরিবারের সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই পত্রের সমাপ্তি টানছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
জিতু

[বি. দ্র. : পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

২. খ.

২০শে অক্টোবর, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
বিনীত
ফাহিম
লোহাগড়া, নড়াইল।

আমাদা বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির প্রতি নজর দিন

নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানাধীন আমাদা বাজারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোহাগড়াসহ আশপাশের প্রায় দশ গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে আসছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিল্ডিংগুলো পুরানো ও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ নেই। আউটডোর, ইনডোর মিলিয়ে পাঁচজন ডাক্তারের পদ শূন্য হয়ে আছে। সামান্য ঔষধপত্র যা আসে, তারও ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার কেউ নেই। এভাবে সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, কোনো রোগীর প্রতি সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসাটি প্রয়োগ না করার ফলে তার মৃত্যুও ঘটেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দুরবস্থা থেকে উন্নতি না হলে গ্রামের মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ পরিস্থিতিতে এলাকার জনগণের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরিয়ে আনতে এবং জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির মান উন্নত করে ও সংস্কার করে সেখানে উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, এ ব্যাপারে যেন আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

নিবেদক
গ্রামবাসীর পক্ষে
ফাহিম

৩. ক. লাইব্রেরির সঙ্গে নীরব মহাসাগরের তুলনা করা যায়। যুগ যুগ ধরে অগণিত জ্ঞানী-গুণী মানুষের চিন্তা-ভাবনা বইয়ের পাতায় স্থায়িত্ব লাভ করে। মানুষের অর্জিত জ্ঞান এই বইয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরিতে সঞ্চিত হয়ে আছে।

৩. খ. নবীনের কর্মচঞ্চলতায় পৃথিবী নতুন রূপে সাজে। যারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা পরিবর্তনকে ভয় পায়। তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে সবাইকে উজ্জীবিত হতে হবে।

৪. ক. বিদ্যা ও ধন মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এ বিদ্যা ও ধনের সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে না লাগলে এ দুটোর কোনো মূল্য নেই।

গ্রন্থের সাহায্যে আমরা বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানলাভ করে থাকি। কিন্তু অর্জিত বিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ না শিখলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যা লিখিত আছে। গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করলে তা অর্জন করা যায়। কিন্তু শুধু পুথিগত বিদ্যা কোনো কাজে আসে না। তাকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। পৃথিবীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। পরিশ্রম করলেই তা উপার্জন করা যায়। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম করে তা উপার্জন না করলে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সুদিনে অনেক বন্ধু পাওয়া গেলেও দুর্দিনে কাউকে পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারে প্রচুর গ্রন্থ থাকলেই চলে না। তাদের মধ্যে যেসব জ্ঞানের বিষয় আছে, সেগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে কোনোই প্রয়োজন মেটে না। নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে ধনসম্পদ পরের হাতে তুলে দিলেও প্রয়োজনের সময় ফিরে পাওয়া যায় না। যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদ্যা ও ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তা যদি যথাসময়ে পাওয়া না যায়, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। যে জ্ঞান কোনো ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, সে জ্ঞান দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হয় না; জগতেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। তাই আমাদের উচিত, অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা এবং জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা।

ধন মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। ধন অর্জন করে কেউ যদি অপরের নিকট রেখে দেয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না। তেমনি বিদ্যাও যদি কেবল গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা জীবনের কোনো কাজে লাগে না।

৪. খ. কেবল বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্ধক্যকে বিচার করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও কর্মস্পৃহার তারতম্য মানুষকে তরুণ ও বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে।

মানুষ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ বার্ধক্য ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সবাইকে মানসিকভাবে জরাগ্রস্ত করতে পারে না। এদের কর্মশক্তি ও মানসিক শক্তি অনেক তরুণকে হার মানায়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক তরুণ রয়েছে– যারা নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না, অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। তারা

আসলে তারুণ্যের খোলসে বার্ধক্যকে লালন করে। আর যেসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ইতিবাচক ভাবনায় জীবনকে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের অমিতশক্তি ধারণ করে। তরুণরা সব সময়ে আলোর পথের যাত্রী। কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে তারা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। যুক্তির আলোয় কুসংস্কারকে বাতিল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে নতুন সত্য। তারা ধ্বংস ও মৃত্যুকে পিছনে ফেলে সৃষ্টির আনন্দে এগিয়ে যায়। তারুণ্যের এই বোধ ও অনুভূতি যেকোনো বয়সের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। প্রকৃত বৃদ্ধ তারা, যারা তারুণ্যের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে চায় না, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে অস্বীকার করে, নতুন সূর্যের আলোয় অস্বস্তি বোধ করে। তারা তারুণ্যের অগ্রযাত্রায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বার্ধক্যের পরিচয় বয়সে নয়, পশ্চাদ্‌মুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

৫. ক.

২৫শে জানুয়ারি, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ।

বিষয় : স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন।

সূত্র : ম.জি.স, ২০২.../২/(২৮)

মহোদয়,

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ২০২... সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা	:	তৌসিফ আহমেদ, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়	:	২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

শেরপুরে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

ফরহাদ, শেরপুর প্রতিনিধি, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের ফুটবল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলা প্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৬. ক. **ভূমিকা :** বাংলার মুসলিম নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুক্তমনা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মহল্লায় মহল্লায় ছাত্রী সংগ্রহ করে নারীশিক্ষা বিস্তারে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি শুধু সমাজসেবিকাই নন, বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পীও বটে। সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী গদ্য রচনাও তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল।

জন্ম ও বংশপরিচয় : ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মুহম্মদ আবু আলী সাবের। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এ পরিবারে পর্দাপ্রথা এত কঠোর ছিল যে, মহিলারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাকরানি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে যেতে পারতেন না।

শিক্ষাজীবন : রোকেয়ার সময় মুসলমানগণ অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ইংরেজি শিক্ষার নামে তারা শিউরে উঠত, নারীশিক্ষাকে তারা মহাপাপ মনে করত। এরূপ এক তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে বেগম রোকেয়ার জন্ম। রোকেয়ার পিতাও সমাজের কুসংস্কার হতে মুক্ত ছিলেন না। এ কারণেই রোকেয়াকে কুরআন শরিফ ছাড়া আর কিছুই পড়তে দেওয়া হয়নি। বেগম রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। রোকেয়ার বড়ো ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাবের তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। গভীর রাতে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে বালিকা রোকেয়া মোমবাতির আলোতে বড়ো ভাইয়ের কাছে ইংরেজি ও বাংলা পড়তেন। শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও এভাবে দিনের পর দিন তাঁর শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দেখে ভাইও তাঁকে যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। আর এ সময়েই বেগম রোকেয়ার মনে মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতি কীভাবে দূর করা যায়, সেই ভাবনা জন্ম নেয় এবং এক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন সহযোগিতা করেন।

বৈবাহিক জীবন : বিহারের ভাগলপুরে রোকেয়ার বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাঁর সাহায্যে বেগম রোকেয়ার শিক্ষার ক্রমোন্নতি হয়। নিজে শিক্ষালাভ করেই বেগম রোকেয়া থামলেন না, তিনি বাংলার মুসলিম নারীদের দুর্দশাও লক্ষ করলেন। বুঝলেন, শিক্ষার বিস্তার না হলে তাদের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত হলেন।

কর্মজীবন : নিয়তির কী পরিহাস, বিয়ের নয় বছর পর ১৯১১ সালে রোকেয়াকে নিঃসন্তান অবস্থায় রেখে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন পরলোকগমন করেন। সংসারের বাঁধন হতে মুক্ত হয়ে বেগম রোকেয়া নারী জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মনস্থ করেন। সে অনুযায়ী রোকেয়া শ্বশুরালয় ভাগলপুরে একটি স্কুল খুলে শিক্ষাদান করার চিন্তা করেন। কিন্তু স্কুল খোলায় নানারকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে স্বামীর প্রদত্ত শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে স্কুল স্থাপিত হলো। রোকেয়া নিজেই স্কুলের ছাত্রীদের পড়াতে লাগলেন। কিন্তু অনেক বাধাবিপত্তি তাঁকে মোকাবিলা করতে হলো। বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে, শত বিদ্রূপ-অপমান সয়ে তিনি স্কুলের জন্য সংগ্রাম করে চললেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে তাঁর সাধনা সফল হলো। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল একটি প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হলো। এছাড়াও রোকেয়া সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকাতায় ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।

সাহিত্যিক রোকেয়া : কর্মী রোকেয়া যত বড়ো, সাহিত্যিক রোকেয়া আরও বড়ো ও খ্যাতিমান। রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল তাঁর কর্মশক্তির অপূর্ব নিদর্শন। স্কুলের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি 'মতিচূর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি বই রচনা করেন। তাছাড়া তিনি 'সুলতানার স্বপ্ন' (Sultana's Dream) নামক একখানা ইংরেজি বইও রচনা করেন। তাঁর রচিত বইগুলো বাংলার মুসলিম নারী জাগরণে এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত। তিনিই বাংলাদেশের মুসলিম নারী আন্দোলনের জন্মদাত্রী ও পথিকৃৎ।

উপসংহার : ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মহীয়সী রমণী পরলোকগমন করেন। বেগম রোকেয়া নারী-মুক্তির দূত হয়ে এসেছিলেন। মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতির কথা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই বাংলার নর-নারী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। কারণ রোকেয়ার কীর্তি অমর– তাঁর স্মৃতি অক্ষয়।

৬. খ. **ভূমিকা :** গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্য সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন

করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিষ্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে, তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মতনির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যেকোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. গ. **ভূমিকা :** বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় খাত। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জনগণের উদার আতিথেয়তা এ শিল্পের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যপিপাসাকে নিবৃত্ত করে। এমন পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পর্যটনশিল্প। কিন্তু বাংলাদেশে এ শিল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি নেই। অথচ পর্যটনশিল্পে এদেশে অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে।

পর্যটনের পরিচয় : প্রাচীনকালে মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন। সেসময়ে যোগাযোগব্যবস্থা খুব কষ্টকর ও দুর্গম থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণপিপাসুরা ঘুরে বেড়িয়েছেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি এসব বিখ্যাত পর্যটকের অনেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিলেন। আজ পর্যটন পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মানুষের অদেখাকে দেখার অভিপ্রায় থেকেই।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন : একসময় বাংলাদেশ পর্যটনশিল্পে বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন শাসক-শোষক শ্রেণির কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের হারিয়ে যাওয়া পর্যটনশিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৪৩নং আদেশবলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্যোগ সূচিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ১৯৭৫ সালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশসাধন করা। এর ফলে এ শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা যাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। খাতটি নানাভাবে এদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্পের অবদান অতুলনীয়। পর্যটন কর্পোরেশন মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার মধ্যে একটি। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটনশিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল এবং পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-বিদেশে কর্মরত রয়েছে।

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে। দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে এদেশের আর্থিক সমৃদ্ধি এনেছে। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে, যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের আমাদের দেশটি যেন প্রাকৃতিক এক মিউজিয়াম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দৃষ্টিনন্দন এদেশটি যুগে যুগে তাই অনেক কবি-লেখক তৈরিতে সহায়ক হয়েছে এবং বিখ্যাত পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে।

বাংলাদেশের অনুপম নিসর্গ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন কেন্দ্রগুলো। এসব অনুপম নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগের জন্য বাংলাদেশ যুগে যুগে হাতছানি দিয়েছে কাছের ও দূরের ভ্রমণপিপাসুদের। তারা অবাক হয়ে এদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। অনেকেই তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় প্রশস্তি গেয়েছেন বাংলাদেশের মনোলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। তাই বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধ একজন পর্যটক বলেছেন– বাংলাদেশে প্রবেশের হাজার দুয়ার খোলা রয়েছে কিন্তু বেরুবার একটিও নেই।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দেশে ক্রমান্বয়ে বিদেশি পর্যটক এবং পর্যটন খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়ে চলেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দ্য নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন' অনলাইনে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় শীর্ষ দশ স্থানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত 'কক্সবাজার' ও বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবন'।

বাংলাদেশের পর্যটন স্পট : ভ্রমণের নেশা মানুষের স্বভাবগত। প্রকৃতি যে অন্তহীন সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসে আছে, একমাত্র দেশভ্রমণের ফলে তা পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে অবাধ চলার সুযোগ করে দিয়েছে বলেই মানুষ খুব সহজেই দেশ-দেশান্তরের দর্শনীয় স্থানগুলো উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় দেশ। বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল প্রাকৃতিক শোভা সত্যিই নয়নাভিরাম। তাছাড়া কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই উপভোগ করা যায় কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে। ঐতিহাসিক পর্যটন নিদর্শন হিসেবে খ্যাত মহাস্থানগড়, রামসাগর, সোনারগাঁ, লালবাগ দুর্গ, কান্তজীর মন্দির প্রভৃতি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত রাঙামাটি, বান্দরবান, কাপ্তাই হ্রদ, মহেশখালী, সুন্দরবন, জাফলং প্রভৃতি পর্যটন স্পট রয়েছে।

পর্যটন কেন্দ্রগুলো আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকারি উদ্যোগ : বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে গতিশীল ও আকর্ষণীয় করার জন্য এবং স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলো সুপরিচিত ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার এক্সক্লুসিভ জোন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের পর্যটনশিল্পকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য একটি খসড়া নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইনানী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপের উন্নয়নে মাস্টারপ্লানের কাজ চলছে। কুয়াকাটা পর্যটনকেন্দ্রের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ওই এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের পর্যটনশিল্প বিপুল সমৃদ্ধি বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার : বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প এক অভাবনীয় উন্নয়নের সোপান। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পকে আরও উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি আমরা বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারি। আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এদেশের পর্যটনশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে– এটাই আজকের প্রত্যাশা।

মডেল টেস্ট- ১০

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	ক	৩	ঘ	৪	ক	৫	খ	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	গ	১০	খ	১১	ক	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতাসংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, পাকিস্তানি সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

১. খ. এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিষ্কারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্টফোন। এই স্মার্টফোনে কথা বলা যায়, খুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিও শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২. ক.

৫ই জুন, ২০২...
বরাবর
চেয়ারম্যান
লাকসাম ইউনিয়ন পরিষদ, কুমিল্লা।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা কুমিল্লা জেলার লাকসাম ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্পকারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।
নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
নাবিল
লাকসাম, কুমিল্লা।

২. খ.

রবীন্দ্রজয়ন্তী ১৪...

সুধী,

আগামী ২৫শে বৈশাখ, ১৪...; ৮ই মে, ২০২... শনিবার সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬.....তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে স্কুল-মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ময়মনসিংহ জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব সাব্বির জামান। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন মিন্টু কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফরিদ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব সফিউল্লাহ্।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

বকুল আহম্মেদ

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

ময়মনসিংহ জিলা স্কুল ছাত্রসংসদ

অনুষ্ঠানসূচি

১০:০০ : অতিথিদের আসন গ্রহণ

১০:০৫ : 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ

১০:৩০ : প্রধান অতিথির ভাষণ

১০:৪৫ : সভাপতির ভাষণ

১১:০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি

১১:৩০ : নাটক 'চিরকুমার সভা'

১২:০০ : অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

৩. ক. অভ্যাসের দাস না হয়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। এটাই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ। মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনের জন্য চাই সাধনা। সাধনার মাধ্যমেই মানুষ পাপ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হতে পারে।

৩. খ. শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রম ও অপরিসীম ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তারাই সত্যিকারের মহৎ মানুষ। কিন্তু বাস্তবজীবনে এরা বঞ্চিত, শোষিত ও উপেক্ষিত। এখন দিন এসেছে। শ্রমজীবী মানুষেরাই একদিন নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পালাবদলের সূচনা করবে।

৪. ক. ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা পালনের জন্য অন্যকে উপদেশ দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি না– এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্‌বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

৪. খ. কুসংস্কার ও লোকাচার যে-কোনো জাতির জন্য পশ্চাৎপদতার কারণ। লোকাচারে আবদ্ধ জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। জাতির প্রাণ শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার আলোকস্পর্শে আসার পরই কেবল যেকোনো জাতির প্রগতিশীল সমাজের প্রত্যাশা করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তর হতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পুরাতন চিন্তাধারার অপসারণ ঘটানো গেলে কল্যাণকামী জাতি গঠন সম্ভব। নদীকে স্রোতস্বিনী রাখতে হলে তার গতিপথের বাধাগুলো অপসারণ করতে হয়। তেমনি জাতীয় জীবনকে প্রগতিমুখী করার জন্য তার

ভেতর মুক্তচিন্তার ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। একথা সত্য, চিন্তার মুক্তি ছাড়া মানসিক দীনতার বেড়াজাল ছিন্ন করা যায় না। আর মানসিক মুক্তি ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বসমাজে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। প্রগতির ধারায় পেছনে পড়ে গেলে জাতিকে তখন আঁকড়ে ধরে জীর্ণ লোকাচার ও কুসংস্কার। জ্ঞানানুশীলন ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার অভাবে জাতি তখন প্রাণশক্তি হারাতে থাকে। হারিয়ে যেতে থাকে তার সম্ভাবনার অপার সম্ভার। জীর্ণ অতীতের প্রতি জাতির মোহান্ধতার কারণে ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে ফিকে। জাতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যোগ্য করার জন্য আধুনিক শিক্ষা ও জীবনদৃষ্টির লালন অত্যাবশ্যক হিসেবে আমাদের মানতে হবে। সেই সাথে সকল প্রকার লোকাচার ও অজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে সবাইকে। প্রথা ও প্রাণহীন লোকাচারের বদলে মুক্তবুদ্ধির চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আর এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে আমাদের জাতি মধ্যযুগের অচলায়তনেই পথ হাতড়ে মরবে।

মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া সামাজিক প্রগতি অর্জিত হবে না। জাতীয় মুক্তির স্বার্থেই প্রথা ও লোকাচারের নিগড় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে।

৫. ক. ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...

বরাবর

প্রধান শিক্ষক,

ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ।

বিষয় : স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন।

সূত্র : ম.জি.স, ২০২.../২/(২৮)

মহোদয়,

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ২০২... সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : তৌসিফ আহমেদ, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি

প্রতিবেদনের শিরোনাম : ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

প্রতিবেদনের ধরন : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময় : ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২...

মাননীয়

প্রধান শিক্ষক,

সিলেট জিলা স্কুল, সিলেট।

বিষয় : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার প্রদত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...; স্মারক নং সজস– ২২/২০২... পত্রের আদেশক্রমে বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রদত্ত হলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তি শেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : রাকিব হাসান
প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** জনাব জীবনে সময়ানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে, সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত, তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে– এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না, তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার,

লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইনশৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. খ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করত। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক, যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের

জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে, তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,

২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,

৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,

৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,

৫. বেকার যুবকদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

৬. গ. **ভূমিকা :** বাংলাদেশের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

অর্থনৈতিক সুচকে বাংলাদেশ : ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫,০০০ টাকা)। অথচ ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে এই হার ৮.১৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার (প্রায় ১,৬১,০০০ হাজার টাকা)। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশেরও কম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। বড়ো

বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে ছোটো-বড়ো অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামো যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদনব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোর-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটাইলাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারীশিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষিশিল্প, পোশাকশিল্প, ঔষধশিল্পসহ প্রতিটি শিল্প খাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে; উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। তারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ পণ্য রপ্তানি আয়।

প্রতিবন্ধকতা : ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মতো আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগপর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারে : অদম্য বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা।